৮.০২ হাংহার রহস্য – Bangla Library

৮.০২ হাংহার রহস্য – Bangla Library

হাংহার রহস্য -১২২

হাংহা সরাইখানার নিকটে পৌঁছে গেলো বনহুর আর মোহসিনের গাড়িখানা। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও জমাট বেঁধে ওঠেনি। সবেমাত্র সরাইখানার লণ্ঠনগুলোতে আলো ধরানো হয়েছে।

গাড়ি থামতেই মংলু এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর আর মোহসিন নামলো গাড়ি থেকে।

বনহুর মংলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ করে বললো–মংলু, আমরা আজ তোমাদের সরাইখানায় থাকবো।

অবাক হয়ে বললো মংলু-স্যার, আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো, তারপর একটু হেসে বললো—হোটেল হাংহার সবচেয়ে নামী ছেলে তুমি। তোমার নাম জানতে কোনো অসুবিধা হয়নি। চলো আমাদেরকে ভেতরে নিয়ে চলো মংলু।

স্যার, আপনাদের সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই?

না, তেমন কিছু নেই।

চলুন স্যার।

মংলু আর বনহুর এগুলো।

মোহসিন তাদের পেছনে এগিয়ে চললো।

বললো বনহুর –মংলু, আমাদের জন্য নির্জন একটা ঘর বেছে দিও।

কেন স্যার? আপনি নির্জন ঘর চাচ্ছেন কেন? মংলু থেমে পড়ে প্রশ্ন করলো বনহুরকে।

এমন সময় আবছা অন্ধকার থেকে ভেসে এলো একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর মংলু, খদ্দেরের সঙ্গে এত কথা বলছিস কেন? বাবুদের ঘরে নিয়ে আয়।

বনহুর আর মোহসিনের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেইদিকে, দেখলো- ঝাঁকড়াচুল, ভীষণ চেহারার এক মানুষ আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর মংলুকে লক্ষ্য করে বললো—তোর বাবা রংলাল বুঝি?

এবারও মংলু অবাক হয়ে তাকালো বনহুরের দিকে। ভাবলো মংলু, কি করে লোকটা তার বাবার নামটাও জানলো?

কিন্তু আর ভাববার সময় পেলো না মংলু, তার বাবা রংলাল পুনরায় ডাকলো- মংলু, বাবুদের নিয়ে আয়।

মংলু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললো—চলুন স্যার, আপনারা চলুন।

বনহুর আর মোহসিন মংলুর পেছনে পেছনে সরাইখানায় প্রবেশ করলো। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর রংলালকে।

মনে পড়লো আরমানের বন্ধু যখন এ সরাইখানার সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে বর্ণনা করছিলো তখন মংলুর বাবা রংলালের যে চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো আজ তা যেন সত্যি সত্যি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো। তাই বনহুর সহসা চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না। কিন্তু এভাবে রংলালের দিকে তাকিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই সন্দেহ হতে পারে রংলালের মনে, তাই বনহুর বিলম্ব না করে সরাইখানায় প্রবেশ করলো।

হাংহা সরাইখানা বনহুরের কাছে নতুন। কারণ সে এখানে পূর্বে আসেনি কোনোদিন। তবে জায়গাটা নতুন হলেও তার কাছে সব যেন চেনা মনে হচ্ছে। প্রতিটি দরজা-জানালাও যেন পরিচিত। আরমানের বন্ধু তাকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছে।

মংলু বললো–স্যার, আপনার জন্যে এই ঘর আর আপনার সংগীর জন্য ওপাশের ঘর।

বনহুর বললো–আমরা একঘরেই থাকতে চাই।

তা হয় না স্যার, কারণ আমাদের হাংহা সরাইখানার প্রতিটি ঘরে একটি করে বিছানা। আর এক এক ঘরে এক জন করেই থাকার নিয়ম।

আচ্ছা, তাই হবে। আমরা শুধু রাতটাই থাকবে তারপর চলে যাবো।

আচ্ছা স্যার।

বনহুর আর মোহসিনকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো।

খাবার টেবিলে বললো মোহসিন—সর্দার, আমার কেমন যেন সন্দেহ লাগছে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

আল্লাহ ভরসা। তবে মোকাবেলার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ আমাদের গাড়ি যখন হীরাঝিলের নিকটবর্তী হচ্ছিলো তখন আমরা শুনতে পেয়েছি একটা শব্দ; সে শব্দ যে অপর কোনো গাড়ির তাতে কোনো ভুল নেই।

হাঁ, আমি জানি সর্দার, কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে আমাদের গাড়িখানাকে অনুসরণ করছিলো। হীরাঝিলে অবস্থানকালে আমি মনে করেছিলাম কোনো শত্রু আমাদের......।

হেসে বললো বনহুর আক্রমণ করে বসবে......

হাঁ, ঐ রকমই আমার ধারণা ছিলো।

কিন্তু সে ধারণা থেকে আমরা অব্যাহতি পাইনি। মোহসিন, সাবধান হাংহা সরাইখানার রহস্য উদঘাটন করতে এসে আমরা যেন পরাজিত না হই।

বনহুর আর মোহসিন নিচু গলায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছিলো।

ওপাশের টেবিলে দুজন লোক বসে কফি পান করছিলো আর বেশ হাসি-ঠাট্টা করছিলো। ওরা মাঝে মাঝে বনহুর আর মোহসিনের দিকে তাকাচ্ছিলো।

বনহুর বললো—মোহসিন, এরা নিশ্চয়ই আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ করছে।

হাঁ সর্দার, আমারও তাই মনে হয়।

বনহুর আর মোহসিন খাওয়া শেষ করে নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করে।

দুগ্ধফেনিল শয্যা, মেঝেতে কার্পেট বিছানো। মেঝের মাঝখানে টেবিল। টেবিলের ফুলদানিতে অর্ধশুষ্ক ফুল। হয়তো বা সকালে ফুলগুলো ফুলদানিতে রাখা হয়েছিলো। মরুভূমির শুল্ক হাওয়ায় এখন ফুলগুলো মুষড়ে পড়েছে।

বনহুর শয্যায় শয়ন করবার পূর্বে ওদিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। জানালার কপাট বন্ধ ছিলো। বনহুত্র জানালো খুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ হিমেল হাওয়া প্রবেশ করলো কক্ষে।

তাকালে বনহুর বাইরের আকাশের দিকে।

তারাভরা আকাশ।

অজানা অচেনা সরাইখানা তবু আকাশটাকে বড় পরিচিত মনে হয় বনহুরের কাছে। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর। এই সেই জানালা, যে জানালার লোহার শিকগুলো আরমান তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো দূরে। এখনও জানালাটা শিকবিহীন অবস্থায় আছে এবং সে কারণেই ওটা বোধ হয় বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো।

বনহুর জানালাপথে আবছা অন্ধকারে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলো এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ায় মংলু।

পদশব্দে ফিরে তাকায় বনহুর, মংলু বললো—-স্যার কিছু লাগলে আমাকে ডাকবেন। আমি পাশের ঘরে থাকি।

বনহুর বললো–মংলু!

বলুন স্যার?

তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

সবাই এ কথা বলে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ স্যার।

কেন তোমাকে ভাল লাগে বলতে পারো?

তা আমি কেমন করে বলবো!

বনহুর শয্যায় এসে বসলো, তারপর মংলুর পা হতে মাথা পর্যন্ত লক্ষ্য করে বললো- আমার এক সহচর ছিলো, তার নাম ছিলো মংলু। তাই তোমাকে খুব ভাল লাগে।

কি জানি স্যার, অন্য যারা আসেন তারাও আপনার মত বলেন–তোমাকে খুব ভালো লাগে।

যাবার সময় মোটা বখশীস দিয়ে যায় বুঝি?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে মংলু–না স্যার, সে সৌভাগ্য আমার হয় না।

কেন?

সে অনেক কথা, এখন যাই স্যার।

আর একটু বসো না মংলু?

না স্যার, বাবা বকবে।

তোমার বাবা এখানে থাকে বুঝি?

কখনও কখনও থাকে আবার চলেও যায় যেদিন তার ইচ্ছা হয়। আজ আর দেরী করতে পারছি না স্যার, আবার আসবো। বেরিয়ে যায় মংলু।

বনহুর দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে শয্যায়।

ব্যাগ খুলে বের করে নাইট ড্রেস এবং রিভলভারখানা হাতের আড়াল করে বালিশের তলায় রাখে।

রিভলভারখানা বালিশের নিচে রেখে ফিরে তাকাতেই বনহুর শুনতে পেলো এব কঠিন হাসির শব্দ। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে ঠিক বোঝা গেলো না।

বনহুর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। টেবিলে লণ্ঠন জ্বলছে।

হাসির শব্দটা বনহুরের মনকে বিচলিত করলো না। কারণ হাংহা সরাইখানার রহস্য উদঘাটনেই সে এখানে এসেছে এবং এমন বিস্ময়কর ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর।

এবার হাসির শব্দ থেমে গেলো, ভেসে এলো একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর-বনহুর, তুমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা সফল হবে না বরং তুমি আমার শিকারে পরিণত হলে....

বনহুর শয্যায় উঠে বসলো, ভালভাবে লক্ষ করলো কোথা হতে কথাগুলো ভেসে আসছে। কক্ষটা বিরাট ও প্রশস্ত ছিলো, দেয়ালগুলো মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি। জানালাগুলো দিনে ভোলা থাকলেও রাতে বন্ধ থাকে। কক্ষের ছাদ মোটা কাঠ দিয়ে তৈরি। দরজা মোটে একটা তাও মজবুত তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে।

বনহুর একটু হেসে পাশ ফিরে শুলো।

লণ্ঠন জ্বলছে।

এরপর আর কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেলো না। বনহুরের চোখ দুটো বন্ধ থাকলেও সে ঘুমিয়ে পড়লো না, ভাবছে অনেক কথা। হাংহা রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে সে এসেছে এ। কথা জেনে নিয়েছে হাংহা রহস্যের নায়ক। এমন কি তার নামও জানে সে।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো।

আবার শোনা গেলো সেই কণ্ঠ......বনহুর, তুমি কোনো রকমে হাংহা সরাইখানার গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হবে না, আমার কৌশল তোমাকেও হাংহা রহস্যে জড়িয়ে ফেলবে।

এবার বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে বলে উঠলোনা, না কিছুতেই না। তোমার সাধ্য নেই আমাকে তোমার হাংহা রহস্যে জড়িয়ে ফেলো......

আবার সেই বিস্ময়কর হাসির শব্দ শোনা গেলো। বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার শয্যার পাশে একটি দরজা সৃষ্টি হলো। দরজার মধ্যে জমাট অন্ধকার।

হাসির শব্দ থেমে গেলো, এবার কঠিন কণ্ঠস্বর...বনহুর, তুমি এই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করো......

না, আমি ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে না।

আবার সেই আদেশের সুর...যদি আমার কথা অমান্য করো তাহলে জীবনে মারা পড়বে। কারণ এক্ষুণি তোমার শয়নকক্ষ রাসায়নিক গ্যাসে পূর্ণ হবে। তখন তোমার মৃত্যুও ঘটতে পারে....

না, আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না।

যদি বাঁচতে চাও তবে ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করো বনহুর। আমি জানতাম তুমি অত্যন্ত চতুর কিন্তু দেখছি তুমি অত্যন্ত বোকা। নইলে আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আসতে না। আরমানকে তৈরি করতে আমার ভীষণ বেগ পেতে হয়েছে। যে কোনো উপায়ে ওকে আমার চাই।

এবার বললো বনহুর—আরমানকে তোমার কি প্রয়োজন জানাবে।

নিশ্চয়ই জানাবো, যদি এই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে তা হলে সব জানবে কিন্তু আর কোনো দিন তুমি ফিরে যেতে পারবে না পৃথিবীর বুকে।

তোমার কথা আমি মানি না। আমাকে তুমি কাবু করতে পারবে না......

বেশ পারি কিনা দেখো...।

বনহু শয্যায় উঠে বসেছে।

তার দৃষ্টি ঐ অন্ধকার দরজার দিকে।

লণ্ঠন জ্বলছে।

লণ্ঠনের আলোতে বনহুর দেখলো সরাইখানার কক্ষটি ক্রমান্বয়ে ধুম্ররাশিতে ভরে উঠছে। এত ধুম্ররাশি কোথা হতে আসছে বুঝতে পারে না বনহুর। মনে পড়ে তার আরমানের বন্ধুটির কথা, সে যখন গল্প করছিলো তখন বনহুর তার কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছিলো, ধূম্ররাশি কিভাবে হংহা রহস্য সৃষ্টি করছিলো। এ মুহূর্তে বনহুর ভালভাবে ধর্মরাশির দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই ভয়ংকর মুখ দেখা যায় কিনা।

কিন্তু নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

আশ্চর্য, ঐ দরজার দিকে কোনো ধূম্র দেখা যাচ্ছে না, যত ধুম্ভ রাশি এই কক্ষটার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বনহুর একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছে। আর বুঝি নিজেকে সজ্ঞান রাখা সম্ভব হবে না তার।

এবার বনহুর তাড়াতাড়ি ঐ দরজার দিকে অগ্রসর হলো। প্রবেশ করলো দরজার মধ্যে। ঐ দরজার ওপাশে কোনো ধূম্ররাশি নেই। বনহুর এবার নিজকে

সুস্থ বোধ করলো।

আবার সেই কণ্ঠস্বর.....বনহুর, এগিয়ে এসো। আরও এগিয়ে এসো,

বনহুর চলছে।

দরজার ওপাশে সিঁড়ির ধাপ।

বনহুর ধাপ বেয়ে নামতে লাগলো।

একটা হাল্কা আলোর ছটা সেই অন্ধকারময় পথকে কিছুটা আলোকিত করেছিলো। বনহুর যখন এগুচ্ছিলো তখন পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো সেই অজ্ঞাত কণ্ঠ।

বনহুর দেখতে চায় কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভুলে যায়নি বনহুর তার ক্ষুদে রিভলভারখানার কথা। ধুম্ররাশির মধ্যেই সে বালিশের তলা হতে রিভলভারখানা সতর্কতার সঙ্গে পকেটে তুলে নিয়েছিলো।

এবার সে রিভলভারখানা উদ্যত করে চলতে লাগলো।

কণ্ঠস্বর শোনা গেলো...বনহুর বাঁ দিকে যাও, ঐদিকে তোমার জন্য একটি বাহন অপেক্ষা করছে...

বনহুর বা দিকে অগ্রসর হলো।

সে দেখলো সত্যি একটি সুড়ঙ্গপথ এবং একটি লিফটের মত বাহন সেখানে রয়েছে।

বনহুর ইতস্ততঃ করছিলো।

সেই কণ্ঠস্বর উঠে......পড়ো বনহুর।

বনহুর বাহনে আরোহণ করলো।

এবার বনহুর লক্ষ করলো বাহনটা তাকে নিয়ে চলতে শুরু করেছে। এখনও বনহুরের হাতে রিভলভার রয়েছে। বাহনে উঠে দাঁড়াতেই বাহন চলতে শুরু

করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা প্রশস্ত স্থানে বাহন এসে থেমে পড়লো।

সেই কণ্ঠস্বর.....বনহুর, নেমে এসো।

বনহুর নেমে পড়লো।

বাহন থেকে নামতেই তার সামনে একটি ভীষণ চেহারার মূর্তি ভেসে উঠলো।

বনহুর চমকে উঠলো, আরমানের বন্ধুর মুখে শোনা সেই কাহিনীর ভয়ংকর চেহারা সে তার সামনে দেখতে পাচ্ছে। ধীরে ধীরে কক্ষটি ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বনহুরের! অত্যন্ত সজাগ হয়ে সে ঐ ভীষণ চেহারার মূর্তিটা লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লো। বনহুরের লক্ষ্য অব্যর্থ।

কিন্তু লক্ষ্য অব্যর্থ হলেও ভীষণ মূর্তির বক্ষ ভেদ করতে সক্ষম হলো না বনহুরের রিভলভারের গুলি।

বনহুর বুঝতে পারলো ঐ মূর্তির বুকে বুলেটপ্রুফ কিছু লাগানো আছে।

অকস্মাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ভীষণ মূর্তিটা।

বনহুর পরপর গুলি ছুঁড়ে চললো।

তখনও হাসির শব্দ ধূম্ররাশি ভেদ করে বনহুরের কানে ভেসে আসছে। বনহুর অতি কষ্টে পুনরায় গুলি ছুড়লো কিন্তু এবার তার রিভলভার থেকে গুলী নির্গত হলো না। বনহুর বুঝতে পারলো তার রিভলভারে আর গুলি নেই।

হাসির শব্দ থেমে গেলো, বললো ভীষণ মূর্তিটা-বনহুর, তোমার কোনো শক্তিই আর। কাজে আসবে না। এবার রিভলভারখানা ফেলে দাও।

বনহুর রিভলভারখানা পকেটে রাখতে গেলো কিন্তু পারলো না, তার সংজ্ঞা তখন। লুপ্তপ্রায়। কারণ ধূম্ররাশির সঙ্গে ছিলো বিষাক্ত গ্যাস। নিজকে কিছুতেই সজ্ঞানে রাখা সম্ভব হলো না, বনহুর টলতে লাগলো, হাত থেকে খসে পড়লো রিভলভারখানা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুখোশধারী দুজন লোক এসে দাঁড়ালো তার দুপাশে। বনহুরকে তুলে নিলো।

একটা শশা শো শব্দ শোনা গেলো!

কিছুক্ষণের মধ্যেই কক্ষের ধূম্র পরিস্কার হয়ে গেলো।

বনহুরকে ওরা তুলে শুইয়ে দিলো একটা বিছানায়।

সেই ভীষণ চেহারার লোকটা তার অনুচরদ্বয়কে বললো—যাও তোমরা এবার।

ওরা চলে গেলো।

লোকটা খুলে ফেললো নিজের মুখের মুখোশ। তারপর ওপাশের টেবিল থেকে তুলে নিলো একটা সিরিঞ্জ। সিরিঞ্জে গাঢ় সবুজ রঙের ওষুধ ছিলো। লোকটা সিরিঞ্জটা নিয়ে এগিয়ে গেলো বনহুরের দিকে।

শয্যার পাশে এসে বনহুরের হাতখানা তুলে নিলো সে হাতে। এবার লোকটা সিরিঞ্জের ওষুধ পুশ করে বনহুরের দেহে, ঠিক ঐ মুহূর্তে এক ছায়ামূর্তি পেছন থেকে একটি রড দিয়ে লোকটার মাথায় আঘাত করলো ভীষণ জোরে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে। সিরিঞ্জটা পড়ে ভেঙে গেল, ওষুধগুলো মেঝেতে ছিটকে পড়লো।

ছায়ামূর্তি হাতের রডখানা ফেলে দিয়ে শয্যায় শায়িত বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। ছায়ামূর্তির সমস্ত শরীর আলখেল্লায় আবৃত। তার হাত দুখানা শুধু চোখে পড়ে, তা ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুন্দর দুটি কোমল হাত।

শিয়রে বসে বনহুরের মাথাটা ফিরিয়ে নিলো নিজের দিকে। আলখেল্লার মধ্যে দুটি চোখ, দুচোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বনহুরের সংজ্ঞাহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বেরিয়ে গেলো সে।

পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করলো দুজন লোক।

তাদের মুখে মুখোশ পরা রয়েছে। এরাই কিছুক্ষণ পূর্বে বনহুকে শয্যায় তুলে শয়ন করিয়ে দিয়েছিলো। তারা কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো মেঝেতে পড়ে আছে তাদের মালিক। পাশে ইঞ্জেকশান পুশ করার পূর্বে ছিটকে পড়া ভগ্ন সিরিঞ্জখানা। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো একজন–সর্বনাশ, মালিকের এ অবস্থা কেন?

অপরজন বললো—তাই তো, আমি ভেবে পাচ্ছি না ব্যাপারখানা কি?

ওরা দুজন মালিকের দুপাশে বসে পড়লো।

তখন সংজ্ঞা ফিরে আসছে মালিকের।

অনুচরদ্বয় মালিককে তুলে বসালো।

একজন বললো—মালিক, আপনার কি হয়েছে?

অপরজন ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো মালিকের মুখের দিকে।

মালিক বললো—-আমার মাথায় কে আঘাত করেছিলো! কে সে তাকে খুঁজে বের করো আমি তাকে হত্যা করবো। মালিকের দুচোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে যেন! শয্যার দিকে তাকিয়ে বললো—আমার সব প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ করে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আমি তাকে চিরতরে সাজা দিতাম কিন্তু……সব মাটি করে দিলো……তাকালো মালিক সেই ভগ্ন সিরিঞ্জটার দিকে।

অনুচরদের একজন বললো—মালিক, ওকে হত্যা করার আদেশ দিন। আমরা ওকে হত্যা করে ফেলবো।

না, এত সহজে ওকে হত্যা করা যাবে না। ওকে আমি জীবন্ত করে রাখবো। ওর চেহারা বিকৃত হয়ে যেতে যদি আমার ইঞ্জেকশনটা ওর দেহে পুশ করতে পারতাম। কিন্তু কে যেন আমার মাথায় আঘাত করেছিলো যার জন্য আমি ব্যর্থ হলাম……আমার বড় সাধনার ওষুধ পড়ে বিনষ্ট হয়ে গেলো। সর্বনাশ হয়েছে, ঐ ওষুধ আর আমি পাবো না।

অনুচরদ্বয় মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

মালিক বললো—বনহুরকে এই কক্ষে বন্দী করে রাখোসাবধান! সে যেন পালাতে না পারে।

আচ্ছা মালিক। বললো একজন অনুচর।

মালিক বেরিয়ে গেলো।

*

এক সময় জ্ঞান ফিরে এলো বনহুরের। চারদিকে তাকিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে। সব কথা ধীরে ধীরে মনে পড়লো তার। সেই গাঢ় ধূম্ররাশি, ভীষণ বিকট এক চেহারা…সব যেন কেমন এলোমেলোভাবে মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো।

বনহুর উঠে বসলো।

চারদিকে কঠিন দেয়াল।

হাংহা সরাইখানার অভ্যন্তরে এমন সুড়ঙ্গ আছে তা কেউ জানে না। আছে নানা ধরনের কক্ষ এবং অনেক কিছু। সবচেয়ে বড় রহস্য সেই ভয়ংকর বিকট মুখখানা।

কে সেই ব্যক্তি যে আরমানকে নিজের আয়ত্তে নেবার জন্য ভীষণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কি তার উদ্দেশ্য এবং কেনই বা সে আরমানের দেহে কোনো শক্তিশালী ওষুধ প্রবেশ করিয়ে তার মধ্যে এনেছে বিরাট পরিবর্তন।

চমকে উঠলো বনহুর, তার কানে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর…যা তুমি জানার জন্য উদগ্রীব তা কোনোদিন জানতে পারবে না। হাংহা রহস্য উদঘাটন করা তোমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

হবে…চিৎকার করে বললো বনহুর। তোমার উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তবে তুমি রক্ষা পাবে নইলে তোমাকে আমি উপযুক্ত সাজা দেবো।

এবার সেই অট্টহাসির শব্দ।

থমথমে জমাট পাথরে তৈরি ভূগর্ভ কক্ষের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই হাসির শব্দ।

বনহুর কিছুমাত্র বিচলিত হলো না।

তার মুখমন্ডলে কঠিন দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠলো।

*

ওদিকে ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মোহসিন সর্দারের কক্ষে প্রবেশ করে হতভম্ব হলো। কক্ষে সর্দার নেই, বিছানা শূন্য।

মোহসিন যা ভেবেছিলো তাই হলো।

তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিলো হাংহা রহস্য তার সর্দারকেও না জড়িয়ে ফেলে। দরজা খোলা...তবে কি সর্দার বাইরে কোথাও গেছে। কিন্তু এত ভোরে যাবেই বা কোথায়।

শয্যার শিয়রে টেবিলটার উপরে তার হাতঘড়িটা রয়েছে। এমন কি সিগারেটের কেসটাও খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেছে তার সর্দার

মোহসিন যখন ভাবছে তখন তার পেছনে এসে দাঁড়ায় মংলু। বলে মংলু সাহেব, কাকে খুঁজছেন। আপনার বন্ধুকে বুঝি?

মোহসিন বললো—হ্যাঁ। কোথায় তিনি বলতে পারো?

পারি কিন্তু...।

কথা শেষ হয় না মংলুর, ওর পেছনে এসে দাঁড়ায় ওর বাবা রংলাল, বলে–ও কিছু জানে না বাবু। আপনি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

তবে সে গেলো কোথায়?

তা আমরা কেমন করে বলবো বাবু? হয়তো সকাল বেলা বাইরে বেড়াতে গেছেন।

মোহসিন চিন্তিত কণ্ঠে বললো–মংলুর বাবা, তুমি একটু খুঁজে দেখো। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

বাবু, আপনাকে যেতে হবে না। আমি দেখছি। বেরিয়ে গেলো মংলুর বাবা। যাবার সময় ইশারায় মংলুকে বেরিয়ে যেতে বললো সে।

মংলু একবার তার বাবা এবং পরে মোহসিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মোহসিনও এগুলো বংলালের সাথে।

মোহসিন ও রংলাল হাংহা সরাইখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকালো চারদিকে। না, কাউকে দেখা গেলো না। সরাইখানার কর্মচারিগণ জেগে ওঠেনি এখনও। সবেমাত্র লণ্ঠনগুলো নেভানো হচ্ছে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে চারদিকে।

মোহসিনের মনটা অস্থির হয়ে উঠলো।

রংলাল বললোবাবু, ওকে খুঁজে আর ফল হবে না!

চমকে উঠলো মোহসিন, তাকালো রংলালের মুখের দিকে।

রংলাল আবার বললো—আপনার বন্ধু ভাল আছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই...

মোহসিন বললো–তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না! কি বলছো তুমি?

একটু হাসলো রংলাল, তারপর বললো–হাংহা সরাইখানায় যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না।

বলো কি?

হ্যাঁ। তুমি পালাও, না হলে তোমার অবস্থাও তোমার সঙ্গীর মত হবে। পালাও...

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীব্র আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরলো রংলাল।

মোহসিন বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো রংলালের বুকে একটা ছোট্ট সূচের মত তীরফলা এসে বিদ্ধ হয়েছে। সংগে সংগে রংলাল ঢলে পড়লো।

লক্ষ করলে মোহসিন, রংলাল মেঝেতে পড়ে মুখখানা গোটা মুখমন্ডল নীল বর্ণ হয়ে উঠেছে।

চোখ দুটো ওর স্থির হয়ে গেলো।

হা হয়ে গেলো মুখটা।

কোথা হতে ছুটে এলো মংলু। তার বাপুকে ঐ অবস্থায় দেখে ভীষণ চমকে উঠলো। প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো, পরক্ষণেই চিৎকার করে কেঁদে উঠলো- বাপু-বাপুরে...

আকাশ বাতাসে সেই করুণ কান্নার সুর ভেসে উঠলো।

রংলালের মৃতদেহ পড়ে রইলো।

সরাইখানার কোনো কর্মচারী এগিয়ে এলো না রংলালের মৃতদেহ দেখার জন্য।

মোহসিন অবাক হলো কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলো না। সে বুঝতে পারলো সর্দার হংহা রহস্য উদঘাটন করতে এসে নিজেই গভীর রহস্যে তলিয়ে গেলেন।

মোহসিন ফিরে এলো নিজের কক্ষে।

তারপর হাংহা সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

রংলালের লাশ পড়ে রইলো হাংহা সরাইখানার বারান্দায়।

গাড়িতে বসে শুনতে পেলো মোহসিন মংলুর করুণ কান্নার শব্দ। কেন যেন মায়া হলো মোহসিনের, কিশোর বালক মংলু তার বাপুকে হারালো। ছল ছল করে উঠলো তার চোখ দুটো।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিতেই মোহসিন চমকে উঠলো তার গাড়ির চাকায় হাওয়া নেই। মোহসিন বুঝতে পারলো গাড়ির চাকার হাওয়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাধ্য হলো সে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। আবার ফিরে এলো সরাইখানার অভ্যন্তরে। তার মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো। সরাইখানার বারান্দা থেকে ভেসে আসছে মংলুর করুণ কান্নার শব্দ।

মোহসিন ভেতরে ভেতরে বেশ ঘাবড়ে গেলো। বিশেষ করে সর্দারের নিখোঁজ হওয়ায় সে বিচলিত হয়ে পড়েছে। তারপর রংলালের বিস্ময়কর মৃত্যুসব যেন কেমন এলোমেলো লাগছে তার কাছে।

পায়চারী করতে থাকে মোহসিন।

এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো…যতই চেষ্টা করো আর কোনো রকমে এ সরাইখানায় যেতে পারবে না…

মোহসিন তাকালো চারদিকে।

কোথা হতে শব্দটা আসছে।

কিছু বুঝতে পারছে না সে, দুচোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তবে কি সত্যি আর তারা কোনোদিন এই সরাইখানা থেকে ফিরে যেতে পারবে না।

আবার সেই কণ্ঠনা পারবে না। আর কোনো দিন তোমরা এ সরাইখানা থেকে ফিরে যেতে পারবে না। যাও, পাশের দরজা দিয়ে চলে যাও ভেতরে। যদি না যাও তবে রংলালের মত মৃত্যুবরণ করবে।

মোহসিন স্পষ্ট দেখলো তার কক্ষের দেয়ালে একটি দরজার মত পথ বেরিয়ে এসেছে।

সেই পথে মোহসিন প্রবেশ করবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি শব্দ, তীব্র আর্তনাদ। আর্তনাদটি সেই কণ্ঠ যে কণ্ঠস্বর একটু পূর্বে সে শুনতে পেয়েছিলো।

আর্তনাদটি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গুলীর শব্দ। পর পর গুলীর শব্দ চলতে থাকে।

মোহসিন দ্রুত সেই বিস্ময়কর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। আবছা অন্ধকার সেই পথ। মোহসিন তবু চলতে থাকে দ্রুতগতিতে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর মোহসিন দেখতে পায় একটি বড় কক্ষ। ভালভাবে লক্ষ করতেই দেখলো, মেঝেতে ছড়ানো কয়েকটি মৃতদেহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মোহসিন আরও লক্ষ করলো, ওদিকে একটি দরজা রয়েছে। সেইদিক হতে শোনা যাচ্ছে গুলীর শব্দ। মোহসিন ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে প্রবেশ করতেই সে বিস্ময়ে থ’ মেরে গেলো, দেখলো সর্দার রিভলভার

হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঐদিকে কাউকে লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে রেখেছে।

মোহসিন নিশ্চুপ রইলো।

এ মুহূর্তে কথা বলা তার ঠিক হবে না। কারণ সর্দার কাউকে লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করেছে। সে দেখতে লাগলো বিস্ময় নিয়ে।

বনহুর গুলি ছুড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। এবার বনহুর রিভলবার নামিয়ে নিলো।

মোহসিন বুঝতে পারলো সর্দার এতক্ষণ যুদ্ধরত ছিলো, এবার তার যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মোহসিন আর বিলম্ব না করে, তাড়াতাড়ি বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো—সর্দার।

বনহুর মোহসিনকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো–শয়তানটাকে খতম করেছি! খতম করেছি তার অনুচর সবাইকে। এসো মোহসিন....

বনহুরকে মোহসিন অনুসরণ করলো।

একটি সুড়ঙ্গপথ ধরে এগুতে লাগলো বনহুর।

মোহসিন চলছে তার পিছু পিছু।

সরাইখানার ভূগর্ভে এমন ধরনের গোপন পথ এবং গোপন কক্ষ আছে তা সরাইখানায় বসে বোঝার উপায় নেই।

বনহুর এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো যে কক্ষের চারদিকে লৌহ দেয়াল। কক্ষে কোনোরূপ আলো বা হাওয়া প্রবেশের পথ নেই। একটি সুইচে চাপ দিতেই কক্ষের লৌহ দরজা বা ঢাকনা খুলে গেলো। সেই পথে বনহুর আর মোহসিন প্রবেশ করলো।

চারদিকে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক মেশিন এবং যন্ত্রপাতি। একটি লৌহ চেয়ারে বসে আছে একটি বর্ম পরিহিত মানুষ। তার সমস্ত দেহ লৌহ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। মানুষটি কাৎ হয়ে পড়ে আছে চেয়ারের হাতলটার ওপরে।

মোহসিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর বললো—এই সেই ব্যক্তি যে হাংহা রহস্য সৃষ্টি করেছিলো। এসো এবার দেখা যাক সে কে।

বনহুর আর মোহসিন এগিয়ে গেলো।

বনহুর অতি সহজে খুলে ফেললো ওর মুখের লৌহমুখোশখানা। সঙ্গে সঙ্গে মোহসিন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—একি! এ যে মিঃ ইব্রাহীম, হিমাগোর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি–তাকালো মোহসিন বনহুরের মুখের দিকে। কিন্তু বনহুরের মুখে এতটুকু বিস্ময়ের ছাপ পরিলক্ষিত হলো না।

বনহুর মোহসিনের মনোভাব বুঝতে পেরে বললো—আমি পূর্ব হতেই জানতাম হাংহা রহস্য সৃষ্টিকারী কে এবং কি তার উদ্দেশ্য।

সর্দার আপনি…

হাঁ, আমি জানি এবং জানতে পেরেছি বলেই আমি আসল পথ আবিস্কার করতে সক্ষম হলাম–মিঃ ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য সফল হলো না। হাংহা সরাইখানার মাধ্যমে ইব্রাহাম তার মূল উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলো–সে অনেক কথা, পরে সব জানতে পারবে। এসো মোহসিন।

সর্দার, ঐ কক্ষে দেখলাম অনেকগুলো লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে।

হ্যাঁ, ওদের সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হয়েছে। মিঃ ইব্রাহামকে আমি হত্যা করেছি শ্বাসরুদ্ধ করে। ঐ কক্ষে যে অক্সিজেন পাইপ ছিলো আমি তা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। কক্ষের লৌহদরজা বন্ধ থাকায় তার মৃত্যু ঘটেছে। আর এরা যারা মিঃ ইব্রাহামকে তার সহচর হিসেবে সাহায্য করে এসেছে তাদের আমি হত্যা করেছি রিভলভারের গুলীতে। মোহসিন, আমার এই সাফল্যের জন্য একজনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জানি না কে সে এক আলখেল্লা ঢাকা মূর্তি, যে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করেছিলো।

বনহুর আর মোহসিন কক্ষ হতে অগ্রসর হলো সুড়ঙ্গপথের দিকে। কিন্তু অবাক হলো বনহুর আর মোহসিন, সুড়ঙ্গপথ বন্ধ। বনহুর আর মোহসিন চাপ দিতে লাগলো তবু সুড়ঙ্গমুখ মুক্ত হলো না।

এবার বনহুর আর মোহসিন অপর এক দিকে অগ্রসর হলো। দেখলো একটা হ্যান্ডেল রয়েছে একপাশে, বনহুর সেই হ্যান্ডেলে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর মোহসিন একটি গর্তে নিক্ষিপ্ত হলো। পায়ের তলা হতে মেঝেটা সরে গিয়ে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই ফাঁক দিয়ে পড়ে গেলো নিচে।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে মোহসিনকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। তাদের চোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। কক্ষটায় জমাট অন্ধকার না হলেও আবছা অন্ধকার বলা চলে। কক্ষটা গোলাকার, কক্ষের কোনো দরজা জানালা নেই।

উপরে ছাদ।

যে ফাঁক দিয়ে বনহুর আর মোহসিন নিচে এসে পড়ে গেলো সে ফাঁক সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে পড়েছিলো। তাই ছাদেও কোনো পথ বা কিছু নজরে পড়লো না।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো বনহুর আর মোহসিন। তারা দেয়াল হাতড়ে পথের সন্ধান করছিলো। বনহুকে উদ্দেশ্য করে বললো মোহসিন–সর্দার, এদিকে মনুষ্যদেহের স্তূপ বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো—বলছো কি মোহসিন!

হাঁ সর্দার। মনুষ্যদেহই বটে……একটা গন্ধ নাকে আসছে বড় উৎকট গন্ধ।

হাঁ, আমিও গন্ধ পাচ্ছি। বললো বনহুর।

মোহসিন বললো–সর্দার, আমার কাছে দিয়াশলাই আছে জ্বালাবোর

জ্বালো।

মোহসিন দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো।

বনহুর আর মোহসিন অবাক হয়ে দেখলো কক্ষের এক পাশে পাকার মৃতদেহ। মৃতদেহগুলো পচে যায়নি। মমি আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মৃতদেহগুলো হতে একটা উল্কট বিশ্রী গন্ধ বেরিয়ে আসছে। অবাক হয়ে দেখছে বনহুর।

বনহুর বললো–ইব্রাহামের পৈশাচিক হত্যালীলার শিকার এরা। ইব্রাহামের উদ্দেশ্য ছিলো একটা লোককে সে এমনভাবে শক্তিশালী করবে যাকে দিয়ে সে বিশ্বের সবকিছু অসাধ্য কাজ সমাধা করতে পারে এবং যে কারণেই প্রতিদিন তার হাংহা সরাইখানায় যারা রাত্রি যাপন করতো তাদের ওপর চালাতে তার সেই ওষুধের পরীক্ষা। পরীক্ষায় যারা মৃত্যুবরণ করতে তাদের রাখা হতো এখানে। তবে প্রথমে সরাইখানার পেছনে বালুর মধ্যে পুঁতে রাখা হতো, তারপর আনা হতো এখানে...একটু থেমে বললো বনহুর–হাংহা রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। এবার আরমানকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনার চেষ্টা করতে হবে।

চলুন সর্দার, এবার আমরা পৃথিবীর বুকে ফিরে যাই...।

মোটেই সহজ নয় মোহসিন। পথ খুঁজে বের করা মুশকিল আছে। কারণ ইব্রাহাম আমাদের এমন এক স্থানে এনে আটক করেছে যেখান থেকে বেরুনোর পথ অত্যন্ত কঠিন।

পথ খোঁজ করে চললো ওরা দুজন, বনহুর আর মোহসিন। পেছনে মৃতদেহের স্তূপ। দিয়াশলাই কাঠি জ্বেলে দেখতে লাগলো ভালভাবে।

মোহসিন ভীত হচ্ছিলো, এতগুলো মৃতদেহের মধ্যে তারা দুজন জীবিত মানুষ, ভয় পাবার কথাই বটে। ভাগ্যিস সর্দার তার সঙ্গে আছে তাই মোহসিন কতকটা আশ্বস্ত। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে কাটানো যায়, একটা তীব্র-উৎকট গন্ধ তাদের নাড়ীভুড়ি টেনে বের করে আনছিলো।

বনহুর বুঝতে পারে মোহসিন এ গন্ধ সহ্য করতে পারছে না। কারণ বনহুরের নিজেরও বড় অসহ্য লাগছিলো। বললো বনহুর—মোহসিন, হয়তো আমরাও এমনি লাশে পরিণত হবো। বেরুনোর কোনো পথ দেখছি না। তাছাড়া কতক্ষণ এমনিভাবে বাঁচা যায়?

হঠাৎ এক ঝলক আলো প্রবেশ করলো সেই অন্ধকারময় কক্ষে। বনহুর আর মোহসিন বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো একটা আলখেল্লা ঢাকা মূর্তি প্রবেশ করলো সেই কক্ষে। আবছা অন্ধকারে তাকে প্রেতাত্মা বলে মনে হচ্ছে।

ততক্ষণে সেই আলখেল্লাধারী বনহুর আর মোহসিনের পাশে এসে দাঁড়ালো, বললো— চলো তোমাদের পথ দেখিয়ে দেই...।

চমকে উঠলো বনহুর আর মোহসিন, আলখেল্লাধারী পুরুষ নয়নারী। এ যে নারী কণ্ঠস্বর!

বনহুর আর মোহসিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো সেই বিস্ময়কর আলখেল্লাধারিণীকে। শুধু দুখানা হাত নজরে পড়ছে, সুন্দর কোমল দুটি হাত।

হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলো আলখেল্লাধারিণী বনহুর আর মোহসিনের দিকে। বললো আমার হাত ধরে চলে এসো।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিয়ে আলখেল্লাধারিণীর হাত ধরলো।

মোহসিন ইতস্ততঃ করছিলো, হয়তো বা সন্দেহ হচ্ছিলো তার মনে। না জানি ও কে? কি-ই বা ওর উদ্দেশ্য? বনহুর মোহসিনকে দ্বিধা করতে দেখে বললো—মোহসিন, ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দাও……

মোহসিন বুঝতে পারলো, সেও হাত ধরলো সেই আলখেল্লাধারিণীর দিকে।

এবার বনহুর আর মোহসিন আলখেল্লাধারিণীর হাত ধরে এগিয়ে চললো। একটি সরু অন্ধকারময় পথ।

মোহসিন এবং বনহুর জানে না তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এক সময় তারা সুড়ঙ্গমধ্য হতে বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশের নিচে।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো বনহুর আর মোহসিন। এবার বনহুর বললো আলখেল্লাধারিণীকে—কে তুমি যে আমাদের মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করলে? আমি তোমার মুখ দেখতে চাই? আমার অনুরোধ আশা করি রাখবে।

আলখেল্লাধারিণী কোনো কথা না বলেই বিদায় নিচ্ছিলো কিন্তু বনহুর ওকে ধরে ফেললো এবং মুখের আবরণ দ্রুত হাতে উনোচন করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো বনহুর আর মোহসিন। একটি মাংসবিহীন নারীমুখ। স্থানে স্থানে কিছু মাংস পরিলক্ষিত হচ্ছে। চোখ দুটো কপালের কাছাকাছি যেন আটকে আছে কোনো রকমে। দাঁতগুলো সম্পূর্ণ কংকালের মত লাগছে।

নারীমূর্তি তাড়াতাড়ি নিজের মুখমন্ডল আলখেল্লায় আবৃত করে ফেললো।

বনহুর আর মোহসিনের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, তারা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আলখেল্লা আবৃত মূর্তিটার দিকে। একি দেখলো তারা, কোমল দুটি হাত সুন্দর দুটি চরণ যুগল কিন্তু একি তার মুখমন্ডল! কি ভয়ংকার নরকংকাল, মাংসবিহীন একটি মুখ।

বনহুর আর মোহসিন মুক্ত আকাশের নিচে এসেও ভুলে গেলো মুক্তি লাভের কথা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো, তারা একি দেখলো...

বনহুর মোহসিনকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে আলখেল্লাধারিণী বললো আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি তোরা আমাকে দেখে স্তম্ভিত হতবাক হয়ে পড়েছে, ভীতও হয়েছে। তা হবার কথাই বটে। সেদিন আমি যদি তোমাকে উদ্ধার না করতাম তাহলে ঠিক আমার মতই অবস্থা হতো তোমার ঐ সুন্দর মুখখানার। ভয়ংকর রশ্মি দ্বারা তোমার মুখমন্ডলকে বিনষ্ট করে দেবার চেষ্টা আমি নস্যাৎ করে দিয়েছিলাম। যে মুহূর্তে শয়তান তার মেশিন চালু করে তোমাকে বিকৃত করবে ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথায় প্রচন্ড আঘাত করি। ও জানতো না আমি তার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। জানলে আমাকে সে প্রথমে হত্যা করতো। অবশ্য আমার এ জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়, তবুও বেঁচে আছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সেই নারীমূর্তি।

বনহুর বললো—কে তুমি? কি তোমার পরিচয়। যদি তোমার কোনো উপকার আমি করতে পারি। তুমি আমাদের জীবন রক্ষা করেছে।

আলখেল্লাধারিণী একটু হেসে বললো—আমার উপকার করবে তুমি।

হাসলে যে। বললো বনহুর।

আলখেল্লাধারিণী বললো—আমি জীবন্ত, আমার আবার কি উপকার করবে? আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে জীবন কাটাচ্ছি। মানুষ আমাকে দেখলে ভয় পায়– আমি এখন মানুষ নামী জীব। হাঁ, জীবই বটে!

বনহুর বললো—মোহসিন আর আমার বড় উপকার তুমি করেছে। তা ছাড়া আমাদের এই মুক্তি তোমার দান।

বললো আলখেল্লাধারিণী—-তুমি যা করেছে তা আরও মূল্যবান। নরপশুকে হত্যা করে তুমি শত শত মানুষকে রক্ষা করেছে।

এর পেছনেও তোমার সাহায্য কাজ করেছে, এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। যা হোক তোমার জীবন-কাহিনী আমি জানতে চাই। যদি মুক্তি না পেতাম তাতেও দুঃখ ছিলো না। দুঃখ হবে কে তুমি এ কথা না জানতে পারলে!

সত্যি এই তোমার মনের কথা? আজও কেউ আমার জীবন কাহিনী জানতে চায়নি। যারাই আমাকে দেখেছে তারাই আমাকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠেছে। দূরে পালিয়েছে। কেউ। আমার দুঃখ, আমার ব্যথা জানতে চায়নি।

বনহুর আর আলখেল্লাধারিণীর কথাবার্তা হচ্ছিলো তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো মোহসিন। সত্যি সে ভীষণ অবাক হয়ে পড়েছিলো, কারণ এমন অবস্থায় মোহসিন কোনোদিন পড়েনি। এমন চেহারার জীবন্ত মানুষও সে দেখেনি কোথাও। বনহুর অবশ্য মোহসিনের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো। তাই সে মোহসিনের দিকে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

এবার বনহুর বললো আলখেল্লাধারিণীকে লক্ষ্য করে–এখানে যদি বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবে আরো দূরে চলো। আমরা তোমার সব কথা জানতে চাই।

বললো আলখেল্লাধারিণীবিপদ আমার কেটে গেছে। এমন কি তোমাদেরও আর বিপদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

বনহুর বললো–হাংহা রহস্য তাহলে…

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো আলখেল্লাধারিণীহ, নির্মূল হয়েছে ঐ শয়তানটার মৃত্যুর সংগে সংগে।

বনহুরের চোখেমুখে একটা আনন্দদীপ্ত ভাব পরিলক্ষিত হলো। বললো বনহুর–তাহলে বসো আমরা তোমার জীবন সম্বন্ধে জানতে চাই।

আলখেল্লাধারিণী বললো–তোমরা জানো না আমি বসতে পারি না, এমনকি শুতেও পারি না।

তবে ঘুমাও কি করে? বললো বনহুর।

সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাই।

সব যেন কেমন অদ্ভুত লাগছে। বললো বনহুর।

মোহসিনেরও দুচোখে অবাক চাহনি।

আলখেল্লাধারিণী বললো—-আমার আলখেল্লার নিচে আমার দেহের সঙ্গে কয়েকটা পেটি বা কবজা আছে যখন ঘুম পায় তখন কোনো গাছের সঙ্গে নিজেকে আটকিয়ে ঘুমাই। উঃ! আমার জীবন থাকার চেয়ে না থাকাই ছিলো শ্রেয়–

বলো থামলে কেন? বললো বনহুর। তার মনে একটা বিপুল জানার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কে এই মহিলা যার জীবন এমন বিস্ময়কর, দুঃখজনক।

মোহসিনও জানতে চায় কে এই নারী যার মুখমন্ডল মাংসবিহীন ভয়ংকর।

সেই আলখেল্লাধারিণী এবার বলতে লাগলো–আমি সিনহা দেউড়ের এক ধনবানের কন্যা, আমার নাম নীলা। ইব্রাহামের কন্যার সঙ্গে পড়াশোনা করতাম। একদিন কোনো এক ফাংশনে গেলাম আমরা দু বান্ধবী–ইব্রাহামের কন্যা এবং আমি। ফিরবার পথে হঠাৎ আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। কি হয়েছিলো আমি জানি না। যখন জ্ঞান হলো দেখলাম নতুন এক জগৎ। আমি শুয়ে আছি অন্ধকারময় এক কক্ষে। পাশ ফিরতে গিয়ে বুঝলাম আমার হাত-পা এবং সমস্ত শরীর শক্ত দড়ি বা রশি দিয়ে বাঁধা। আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। চিৎকার করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাঁদতে চেষ্টা করলাম তাও পারলাম না, ভয়ে-দুঃর্ভাবনায় আরষ্ট হয়ে গেলাম। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো, দেখলাম সেটা একটা বিস্ময়কর কক্ষ। কক্ষে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বান্ধবীর বাবা ইব্রাহাম। তার হাতে একটি সিরিঞ্জ রয়েছে। আমি তার মুখ দেখে চমকে উঠলাম, কারণ এমনভাবে তাকে কোনোদিন দেখিনি। তাকে দেখেছি পিতৃসমতুল্য। আজ তার চোখেমুখে দেখলাম এক ভয়ংকর হিংস্রতার প্রতিচিহ্ন। আমি স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। কণ্ঠ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। ইব্রাহাম হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারলো, সে বললো—জানো কেন তোমাকে এখানে আনা হয়েছে? তোমাকে আমি নতুন জীবন দান করবো। আমার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো আমি তার কথাগুলো

ভালভাবে অনুধাবন করতে পারছিলাম না। আবার আমার কানে এলো ইব্রাহাম বলছে, তোমাকে দিয়ে আমি আমার সাধনা সম্পূর্ণ করবো। এই ইঞ্জেকশনটা তোমার দেহে পুশ করতে পারলে তুমি অসীম শক্তি শালী হবে এবং আমি তোমাকে দিয়ে অসাধ্য কাজ হাসিল করে নিতে পারবো।

আমি প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম না, আমার শরীরে ইঞ্জেকশন পুশ করবেন না, আমি কিছুতেই আপনার কথা মেনে নেবে না।

হয়তো বা আমার কথাগুলো তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিলো, অট্টহাসি হেসে দ্রুত সরে এলো এবং ইঞ্জেকশন আমার দেহে পুশ করে দিলো হৃদয়হীনের মত।

তারপর আমি কেমন হলাম আমি নিজেই তা জানি না ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম নিজের অস্তিত্ব। আমাকে ইব্রাহাম একটি মেশিনের মধ্যে শুইয়ে দিলো, তারপর আমি কিছু জানি না। যখন আমি পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আমার সমস্ত দেহ কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে, যেমন মৃতদেহ বহুক্ষণ রাখার পর কঠিন বস্তুর মত শক্ত হয়। আমি বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু আর বসতে পারি না, আমি একটা জড়পদার্থের মত হয়ে পড়েছি। উঃ! সেকি কষ্ট, যার কোনো বর্ণনা নেই। এক সময় আমি আমার মুখে হাত স্পর্শ করলাম, বিস্ময়ে-ভয়ে আরষ্ট হলাম, আমার মুখে মাংসের অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি তাও ভাবতে পারলাম না। এরপর থেকে আমি কোনো সময় নিজের মুখে হাত স্পর্শ করিনি। তারপর আমি এখানেই রয়ে গেছি, আর আমি ফিরে যেতে পারিনি আমার বাবা মা আত্নীয় স্বজনদের কাছে। ইব্রাহামকে আমি একবার পেয়েছিলাম আমার হাতের মুঠায় কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারলাম না। আমার বাবার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখলাম ইব্রাহামের অসহায় করুণ মুখে। তাই তাকে ক্ষমা করলাম......

আলখেল্লাধারিণী তার কথা শেষ করে দ্রুতগতিতে চলে গেলো। কোথায় গেলো তার সন্ধান নেওয়া সমীচীন মনে করলো না বনহুর। কারণ বনহুর ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো সে আর লোকসমাজে ফিরে যাবে না, লোকসমাজে নিজকে সে আর প্রকাশ করতে চায় না। একটা গভীর বেদনায় বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

*

হাংহা রহস্য উদঘাটিত হলো বটে কিন্তু বনহুর স্বস্তি পাচ্ছিলো না। সদা-সর্বদা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো একটি তরুণীর অসহায় করুণ মুখ–বীভৎস, কুৎসিত, মাংসবিহীন। তরুণীটি আর ফিরে এলো না, আর কোনোদিন সে আসবে না লোক সমাজে। চিরদিন সে রহস্যের অন্তরালে নিজকে লুকিয়ে রাখবে, হয়তো বা একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে সবার অজান্তে, মিশে যাবে তার নশ্বর দেহটা ভূগর্ভের জমাট অন্ধকারে...

বললো মোহসিন–সর্দার, এবার ফেরা যাক।

হাঁ চল। মোহসিনের কথায় বনহুর সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আবার সেই পথ।

যে গাড়িখানা নিয়ে তারা এসেছিলো সে গাড়ি কোথায় রয়ে গেলো আর তারা খুঁজে পেলো না। অবশ্য হাংহা সরাইখানা ছেড়ে তারা এখন বহু দূরে।

এবার যে পথে বনহুর আর মোহসিন পদব্রজে রওয়ানা দিলো ঘন জঙ্গল পথ এগিয়ে চললো তারা কান্দাইয়ের উদ্দেশ্যে। কোনো নগর-বন্দর বা গ্রাম পেলে কিছু আহার করে নিতে পারতো। কদিন শুধু তারা ফল খেয়ে কাটিয়েছে। বিশ্রাম করেছে টিলার পাশে, গাছের ছায়ায় আবার কখনও গাছের মোটা ডালের ওপরে। এক দিন দুদিন করে কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

গভীর জঙ্গল।

চলছে ওরা দুজন। ক্লান্ত অবসন্ন তাদের দেহ মন।

এ পথে তারা কোনোদিন আসেনি।

সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ।

তরুণীটি তাদের এ পথেই ভূগর্ভ থেকে বহিস্কার করে পথের নির্দেশ দিয়েছিলো। ওর সাহায্য না পেলে সেই পথ বিহীন ভূগর্ভ রহস্যজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসা দুস্কর ছিলো।

হঠাৎ মোহসিন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলোসর্দার, ঐ দেখুন। ঐ দেখুন সর্দার... দক্ষিণ দিকে আংগুল তুলে ধরে বললো সে।

বনহুর তাকালো সেই দিকে।

মুহূর্তে বিস্ময়ে চোখ দুটি তার স্থির হয়ে পড়লো। দেখলো সে, সামনে একটি বৃক্ষের ডালে একটি মস্তকবিহীন দেহ ঝুলছে। দেহটি পুরুষ-দেহ। হাত দুখানা এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। পা দুখানা মোটা রশি দিয়ে শক্ত করে ডালের সঙ্গে লটকানো রয়েছে। এ দৃশ্য অত্যন্ত আশ্চর্যকর।

বনহুর এগিয়ে গেলো মোহসিনসহ।

ভালভাবে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে বললো বনহুরদুদিন পূর্বে একে হত্যা করা হয়েছে।

বললো মোহসিন-সর্দার আশ্চর্য, এই গহন জঙ্গলেও রহস্যজনক হত্যাকান্ড!

মোহসিন, গোটা বিশ্বটাই একটি রহস্যময় জায়গা। গহন জঙ্গল এবং জনমুখর স্থান কোনটাই রহস্যময় ছাড়া নেই। কিন্তু কে, কি উদ্দেশ্যে এমনভাবে একে হত্যা করেছে ভেবে পাচ্ছি না।

হঠাৎ বনহুরের চোখে পড়লো মস্তকবিহীন লাশটার বুকের সঙ্গে আটকানো ছোট্ট একটা চিঠি বা চিরকুট। বনহুর খুলে নিলো চিরকুটখানা, মেলে ধরলো চোখের সামনে। কিন্তু চিরকুটের লেখা সে পড়তে পারলো না, কারণ অজ্ঞাত সে ভাষা। বনহুর অনেক চেষ্টা করেও একটি বর্ণও বুঝতে পারলো না। চিরকুট খানা মোহসিনের হাতে দিলো বনহুর।

মোহসিন চিরকুটখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে অবাক কণ্ঠে বললো—সর্দার, এর একটি বর্ণও বুঝতে পারছি না।

আমিও বুঝলাম না। বললো বনহুর।

কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর বনহুর আর মোহসিন সে স্থান ত্যাগ করে চলতে শুরু করলো। গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলছে তারা বারবার। সূর্যের আলো প্রবেশে সক্ষম নয়, তবুও দিনের আলো কিছুটা বোঝা যায়। ক্ষুধা-

পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লো ওরা। আজ কদিন সম্পূর্ণ উপবাসে রয়েছে, কাজেই পা দুখানা যেন চলতে চাইছে না। মাঝে মাঝে বসে বিশ্রাম করে নিচ্ছিলো বনহুর আর মোহসিন।

এক সময় সন্ধ্যা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে।

সেই অন্ধকারের আবছা আলো ঘন জঙ্গলের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুললো। বনহুর আর মোহসিন বিশ্রাম আশায় একটি নিরাপদ স্থানের সন্ধান করতে লাগলো।ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আর মোহসিন বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো তাদের পাশের বৃক্ষটার সঙ্গে একটি গলাকাটা লাশ ঝুলছে।

মোহসিন চিৎকার করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো–এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই মোহসিন। প্রথম যারা করেছে এটাও তারাই করেছে। অন্ধকারে লাশটা ভাল দেখা যাচ্ছে না তবে ওর দেহের সঙ্গেও ঐ ধরনের চিঠি সংযুক্ত রয়েছে বলে আমার ধারণা।

সত্যি সর্দার, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছি, নিশ্চয়ই কোনো নরপশুদল এ কাজ করে চলেছে।

হাঁ, কোনো ব্যক্তি এই নৃশংস হত্যার নায়ক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সেই অধিনায়ক যে এভাবে হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় মস্তক ছেদন করে মস্তকবিহীন লাশ বৃক্ষে ঝুলিয়ে রেখেছে, এরই বা কারণ কি?

বনহুর আর মোহসিন অনেক ভেবেও কোনো সমাধান খুঁজে পেলো না।

অদূরে এক বৃক্ষশাখায় রাত্রি যাপনের পর আবার তারা যাত্রা শুরু করলো। পেছনে পড়ে রইলো ঝুলন্ত মৃতদেহগুলো।

কিছুদুর অগ্রসর হবার পর দিনের আলোয় বনহুর আর মোহসিন দেখলো আরও একটি ঝুলন্ত লাশ। সব লাশগুলোই ছিলো মস্তকবিহীন।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো।

গভীরভাবে ভাবতে লাগলো, এ রহস্য তাকে উদ্ধার করতেই হবে। কে বা কারা এভাবে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে চলছে। বনহুর যখন তৃতীয় ঝুলন্ত লাশটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলো তখন অদূরে তার নজর ফিরে পড়লো। দেখলো একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট পড়ে আছে। বনহুর এগিয়ে গিয়ে সিগারেটের টুকরাটা তুলে নিলো হাতে।

মোহসিন ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

সিগারেটের টুকরাটি মূল্যবান এবং বিদেশী সিগারেট।

বনহুর গভীরভাবে কিছু ভাবলো–মোহসিন, এই জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও রহস্যের উৎস রয়েছে। এসো, আমরা এই নৃশংস হত্যার উৎস কোথা হতে উৎপত্তি খুঁজে বের করি।

সর্দার।

হাঁ মোহসিন, এমন একটা বিস্ময়কর হত্যারহস্য উদঘাটন না করে আমি আর এ স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসে তাদের কানে।

বনহুর আর মোহসিন কান পেতে শুনলো।

এগিয়ে চললো সেই আর্তচিৎকার লক্ষ করে বনহুর আর মোহসিন। অবশ্য আর্তচিৎকার এখন থেমে গেছে। শব্দটা বেশ দূর থেকে ভেসে এসেছিলো, কারণ শব্দটা ছিলো অত্যন্ত ক্ষীণ। এমন কোনো স্থান হতে সেই আওয়াজ ভেসে এসেছিলো যে স্থান ভূগর্ভে কোনো গোপন স্থান হতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ এগুলো ওরা।

ওদের দৃষ্টি ছিলো সম্মুখে এবং আশেপাশে। যদিও ঘন জঙ্গলে সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো না তবুও তারা নিপুণ দৃষ্টি ফেলে সন্ধান চালাচ্ছিলো। হঠাৎ নজরে পড়লো ঘন জঙ্গলের একস্থানে তাজা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

চমকে না উঠলেও আশ্চর্য হলো, বনহুর কারণ এই গভীর জঙ্গলে এখন জমাট রক্ত আসবে কোথা হতে। নিশ্চয়ই ঐ মস্তকহীন দেহগুলোকে এইস্থানে মস্তক ছিন্ন

করা হয়েছে। আশেপাশে বেশ কিছুটা স্থান জুড়ে পরিস্কার করা হয়েছে আগাছা আর শুকনো পাতা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

বনহুর আর মোহসিন উভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো, বললো মোহসিন —সর্দার, এটাই হত্যাকান্ডের স্থান বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, তোমার অনুমান সত্য। এবার আমরা হত্যাকারীকেও খুঁজে বের করতে সক্ষম হবো। ঐ দেখো রক্তের ধারা ছড়িয়ে যেদিকে মস্তকগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে……

সত্যি……ঐ দেখুন সর্দার, ওদিকে রক্তের ধারা শুকনো মাটি আর শুকনো পাতার উপর ছড়িয়ে আছে।

বনহুর আর মোহসিন রক্তের ধারা লক্ষ্য করে সাবধানে এগুতে লাগলো।

যেদিকে রক্তের চিহ্ন এগিয়ে গেছে সেই দিকে চললো বনহুর, পেছনে মোহসিন। কিন্তু বেশ কিছুটা এগুনোর পর আর তারা রক্তের ছাপ বা রক্তের ধারা দেখতে পেলো না। বনহুর বুঝতে পারলো হত্যাকারী অত্যন্ত সজাগ। গোটা বনটা ওরা চষে ফেললো কিন্তু কোনো কিছুই নজরে পড়লো না।

এক সময় জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো গোটা বনভূমি। একটা বড় বৃক্ষশাখায় তারা আশ্রয় নিলো। আকাশ পরিস্কার নজরে না পড়লেও বনহুর আর মোহসিন বুঝতে পারলো আকাশে মেঘ জমেছে। অল্পক্ষণে বৃষ্টিপাত হতে পারে। রক্তের ছাপ সন্ধান করে ফিরবার সময় তারা অজানা এক বৃক্ষ থেকে কিছু ফল সংগ্রহ করে নিয়েছিলো।

মোহসিন আর বনহুর ফলগুলো খাবে কিনা ভাবছিলো। ক্ষুধায় তারা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো। ফলগুলো দেখতে সুন্দর এবং সুস্বাদু মনে হচ্ছিলো কিন্তু খাবে কি না সন্দেহ জাগছিলো মনে।

বললো মোহসিন–আমি একটি ফল খেয়ে দেখি, যদি খাওয়ার যোগ্য হয় তাহলে খাবো।

বনহুর বলেছিলোনা, আমি একটি ফল খেয়ে পরীক্ষা করে দেখি খাওয়া চলবে কি না।

কিন্তু মোহসিন বনহুরকে ফল খেতে না দিয়ে নিজে খেয়েছিলো এবং ফল খাওয়ার পর সে অবাক হয়ে গিয়েছিলো। বড় সুস্বাদু ছিলো ফলগুলো, মোহসিন হৃষ্টচিত্তে সর্দারকে খেতে দিয়েছিলো।

হেসেছিলো বনহুর।

এখন তারা অনেকটা পরিতৃপ্ত, কারণ ক্ষুধা-পিপাসা দুটোই লাঘব হয়েছে তাদের।

ছিন্নমস্তক ঝুলন্ত দেহটা ছেড়ে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে রক্তের চিহ্ন ধরে কিন্তু আর এগুতে পারেনি। একটা গাছের ডালে চেপে হেলান দিয়ে বসলো ওরা দুজন।

বনহুর মোহসিনকে লক্ষ্য করে বললো—সাবধান হঠাৎ পড়ে না যাও। নিচে হিংস্র, জীবজন্তুর আনাগোনা শুরু হয়েছে।

মোহসিন বললোসর্দার, আমি সজাগ আছি……

হাঁ, সজাগ থাকবে। বললো বনহুর।

রাত বাড়ছে।

গভীর জঙ্গল, নানা ধরনের হিংস্র জীবজন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ বনহুর আর মোহসিনের দৃষ্টিগোচর হলো দূরে কোথাও একটা আলোর বল দোল খাচ্ছে। চমকে উঠলো বনহুর আর মোহসিন, গভীর রাতে অদ্ভুত এ আলো এলো কোথা হতে। কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো তারা। মুহূর্তে নিদ্রাজড়িত ভাবটা কেটে গেলো তাদের।

মোহসিন বললো—সর্দার!

হাঁ দেখতে পাচ্ছি কোনো সাংকেতিক আলো। বললো বনহুর।

মোহসিন বললো–সর্দার, নিশ্চয়ই ঐ আলোর সঙ্গে মস্তকহীন লাশগুলোর সম্পর্ক জড়িত আছে।

বনহুর মোহসিনের কথার জবাব না দিয়ে বললো—এবার একটা সমাধান হবে বলে আশা করছি। মোহসিন, তুমি এই গাছে অপেক্ষা করবে আমি ঐ আলোর সংকেত ধরে এগিয়ে যাবো। যদি কোনো সমাধান খুঁজে পাই তাহলে আমি ভোর হবার পূর্বেই চলে আসবো। আর যদি রাতে ফিরে না আসি তাহলেও তুমি এখানেই অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না আসবো, বুঝলে?

সর্দার, গভীর রাতে গহন জঙ্গলে একাকী যাওয়া সমীচীন হবে বলে মনে করছি না। নিচে অনেক হিংস্র প্রাণী আছে......

মোহসিনের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বনহুর বৃক্ষ থেকে নেমে এগিয়ে চললো। কোনো বাধাই তাকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত করতে পারলো না।

স্তব্ধ হয়ে মোহসিন বসে রইলো গাছের ডালে।

*

আলোর বল দুলছে।

বনহুর অত্যন্ত সতর্কতার সংগে এগিয়ে চলেছে সেই দোদুল্যমান আলোর বলটি লক্ষ্য করে।

তার চারপাশে হিংস্র জীবজন্তুর উপস্থিতি বুঝতে পারছে বনহুর তবু এগিয়ে চলেছে। গভীর অন্ধকারে হিংস্র জীবগুলোর চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

হিংস্র জন্তুর গর্জন শুনতে পেয়ে সাবধান হয়ে পড়ে, আত্মগোপন করে আবার চলতে থাকে। লক্ষ্য তার ঐ আলোর বল।

অবশ্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ এড়িয়ে সাবধানে চলতে হচ্ছিলো তাকে। কারণ এ মুহূর্তে সে কোনো অহেতুক বিপদ কামনা করে না। মস্তকবিহীন ঝুলন্ত-লাশগুলোর গোপন রহস্য তাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে–কে বা কারা এই বীভৎস হত্যালীলার নায়ক।

ঐ আলোর কাছাকাছি এসে গেছে বনহুর।

হঠাৎ একটা মোটা লম্বাটে কিছু তার দেহটা জড়িয়ে ধরলো অন্ধকারে। হিমশীতল সেই বস্তুটি, বনহুর মুহূর্তে বুঝতে পারলো তার দেহটা কোনো সরাজের বেষ্টনীতে আটকা পড়েছে।

সর্পরাজের নিচের অংশ কোনো বৃক্ষশাখায় জড়ানো ছিলো এবং উপরিভাগ দিয়ে বেষ্টন করেছিলো বনহুররের দেহটা।

বনহুর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সর্পরাজের বেষ্টন মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। আলোর বলটি তখনও দুলছে।

প্রাণপণ চেষ্টায় বনহুর সর্পরাজের বেষ্টনী থেকে নিজকে ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে চলেছে।

সেকি ভীষণ শক্তিশালী সর্পরাজটা।

কিন্তু বনহুরের কাছে তাকেও পরাজিত হতে হলো। যদি বনহুরের কাছে কোনো অস্ত্র থাকতো তাহলে এতক্ষণ বিলম্ব হতো না। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই হলো বনহুর আর সর্পরাজ্যের মধ্যে। তারপর সর্পরাজ পরাজিত হলো বনহুরের কাছে।

বনহুর সর্পরাজের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার পরপরই তাকিয়ে দেখলো আলোর বল নিভে গেছে। জমাট অন্ধকারে আছন্ন চারদিক। বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে বনহুর।

ভাগ্য ভাল কি না জানে না বনহুর সে তাকিয়ে দেখলো একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। রশ্মিটা কোথা হতে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবুও বনহুর এগুচ্ছে। আশ্চর্য হলো, বনহুর আলোকরশ্মিটা যেন জমাট অন্ধকারে কাঁপছে।

অতি নিকটে এসে অবাক হলো বনহুর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো একটা গাছের আড়ালে।

আলোকরশির ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেলো বনহুর—দুজন লোক একটি লোককে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে নিয়ে ওরা একটা উঁচু টিলার মত স্থানে কোনো এক গহ্বরে

প্রবেশ করলো। বনহুর লক্ষ করলো যে টিলার মধ্যে লোকটাকে নিয়ে দুজন লোক প্রবেশ করলো সেই টিলার মধ্য হতেই আলোকরশি বেরিয়ে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে টিলার মুখের কাছাকাছি এসে একটি ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। ততক্ষণে টিলার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আলোকরশ্মি আর দেখা যাচ্ছে না মোটেই।

এবার বনহুর চারদিকে লক্ষ রেখে ঝোঁপের মধ্য হতে বেরিয়ে সেই বিরাট আকার টিলারটার কাছে এসে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো কোনো শব্দ ভেতর হতে ভেসে আসে কি না। না, কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না, কোনো আলোকরশি ও তার নজরে পড়ছে না। বনহুর এবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। তাহলে কি পথের সন্ধান পাবে না সে

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এলো বনহুরের—তীব্র আর্তনাদ!

বনহুর টিলার কিছুটা উপরভাগে উঠেছিলো, আর্তনাদের শব্দ কানে যেতেই নেমে এলো নীচে। তারপর ভালভাবে লক্ষ্য করতেই সে দেখতে পেলো একটি সুড়ঙ্গপথ বা ঐ ধরনের একটি ফাঁকা ঐ ফাঁক দিয়ে বনহুর প্রবেশ করলো ভেতরে।

সুন্দর একটি পথ।

বনহুর অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কারণ বনহুরের অভ্যাস ছিলো অন্ধকারে চলাফেরা করা। এ কারণে বনহুরের অন্ধকারে চলতে বা কাজ করতে কোনো অসুবিধা হতো না।

বনহুর সেই সুড়ঙ্গপথে চলতে গিয়ে বুঝতে পারলো সেই আলোকরশ্মি অকস্মাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো কি করে। আলো নিভিয়ে ফেলা হয়েছিলো এবং যে কারণে গোটা বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। এ জন্যই এ পথ নজরে পড়েনি বনহুরের। এবার সে

কিছুটা চলার পর হঠাৎ একটা তীব্র আলোর ঝলকানি চোখে পড়লো তার। বনহুর ভালভাবে সামনে দৃষ্টি ফেলতেই নজরে পড়লো একটি বিরাট কক্ষ এবং কক্ষে কয়েকজন মুখোশধারী লোক একটি টেবিলের পাশে গোলাকারভাবে দাঁড়িয়ে কিছু করছে। বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলো।

দুঃসাহসী বনহুরও দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো, যে দৃশ্য সে দেখলো তা বর্ণনাতীত। একটি লোক টেবিলে শায়িত এবং তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। তখনও দেহটা কাঁপছে দুলে দুলে, গলায় যে জায়গাটা হতে মস্তকটা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো সেই জায়গাটা কেমন যেন সাদা আর ফেনাযুক্ত মনে হলো। তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আরও দেখলো বনহুর ছিন্ন মস্তকটার চোখ দুটো এখনও মুদে যায়নি। কি ভয়ংকর দৃশ্য, বনহুরও শিউরে উঠলো দেখে।

বনহুর এবার বুঝতে পারলো গভীর জঙ্গলে কেমন করে ঝুলন্ত লাশগুলো এলো। এই সেই রহস্যপুরী যেখান থেকে মস্তকবিহীন লাশগুলো বেরিয়ে আসছে এবং তাদের মস্তকহীন দেহগুলোকে গভীর জঙ্গলে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি? বনহুর রহস্য উদঘাটনের আশায় নিশ্চুপ দেখতে লাগলো। লোকটাকে তার উপস্থিতির পূর্বেই হত্যা করা হয়েছে। বনহুর শুনতে পেয়েছিলো তীব্র একটা আর্তনাদের শব্দ। সেই মর্মস্পর্শী আর্তনাদের শব্দটা যে ঐ টেবিলে শায়িত মস্তকবিচ্ছিন্ন লোকটার কণ্ঠস্বর ছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

কিন্তু এভাবে হত্যার কারণ কি? বনহুর ভেবে পায় না।

ওদিকে রাত ভোর হয়ে আসছে।

মোহসিন হয়তো তার সন্ধানে ঐ বৃহৎ বৃক্ষশাখা হতে নেমে পড়তে এবং কোনো বিপদে পড়তে পারে। বনহুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো হঠাৎ দেখলো কয়েকজন অদ্ভুত মুখোসপরা লোক একটি লোককে চোখ বেঁধে নিয়ে এলো সেখানে।

বনহুর স্পষ্ট দেখতে পেলো এবং চমকে উঠলো, যা সে ভাবতে চায়নি তবুও মনের গহনে বারবার উঁকি দিয়েছে–মোহসিন তো কোনো বিপদে পড়বে না। এ মুহূর্তে তার চিন্তাধারাই সত্যে পরিণত হলো, যা সে ভাবতে না চাইলেও তার অবচেতন মনে উঁকি দিয়েছিলো। ওরা যাকে এবার ধরে নিয়ে এলো সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়, তারই বিশ্বস্ত অনুচর মোহসিন।

ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো বনহুর। মোহসিন তাহলে এই মস্তকবিহীন রহস্যজালে জড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ভাববার সময় কোথায়, ওরা

মোহসিনকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলো। টেবিল থেকে মস্তকবিহীন লাশটা সরিয়ে নিলো তারপর মোহসিনকে টেনে হিঁচড়ে টেবিলটার ওপরে তুলে নিলো।

এখনও ওর দুচোখ বাঁধা।

এবার মোহসিনের চোখের বাঁধন উন্মোচন করে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে মোহসিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। ওর হাত দুখানা এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। টেবিলটার ওপরে একপাশে কিছু পূর্বে হত্যালীলার চিহ্নস্বরূপ মস্তকটি রক্ষিত আছে।

মোহসিন এ দৃশ্য লক্ষ করে শিউরে উঠলো, সে বুঝতে পারলো একটু পরে তার অবস্থা এমনি হবে। তার মস্তক-বিহীন দেহটাও ঝুলিয়ে রাখা হবে গহন জঙ্গলের কোনো এক বৃক্ষের ডালে।

মোহসিনকে বেশিক্ষণ ওরা ভাববার সময় দিলো না।

টেবিলে শুইয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো।

মোহসিন বলপ্রয়োগে নিজকে দৃঢ় করে রাখলো, সে কিছুতেই টেবিলে শয়ন করতে চাইলো না।

এবার মুখোশধারী লোকগুলো সবাই মিলে মোহসিনকে জোরপূর্বক টেবিলটার ওপরে শুয়েই দিলো।

বনহুর লক্ষ করছে সবকিছু, একটা অদ্ভুত ধরনের মেশিন টেবিলটার পাশে নিয়ে এলো। মেশিনটার চারটি পায়া বা চাকা আছে। ঠিক টেবিলটার পাশে ওরা এনে মেশিনটা দাঁড় করানো হলো। একটি সুইচে চাপ দিতেই মেশিনের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে একটি ধারালো অস্ত্র। অস্ত্রটি অতি ধীরে নেমে আসতে লাগলো মোহসিনের গলার দিকে।

মোহসিন দুচোখ বন্ধ করে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো।

বনহুর কিছুক্ষণ পূর্বে যেমন একটি আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলো ঠিক মোহসিনের কণ্ঠ থেকে সেই ধরনের আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড তাহলেই মোহসিনের দেহ থেকে তার মস্তকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে লোকটা সুইচ টিপে ধরে দাঁড়িয়েছিলো তার ওপরে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার হাত সরে গেলো এবং ধারালো অস্ত্রটা গুটিয়ে গেলো মেশিনটার মধ্যে।

প্রথমে মোহসিন কিছু বুঝতে পারলো না কিন্তু পর মুহূর্তেই সে বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে লক্ষ করলো তাদের সর্দার ভীষণভাবে লড়ছে লোকগুলোর সাথে।

চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো ওদের আসবাবপত্রগুলো।

মেশিনটা ঠেলে দিলো বনহুর একজনের দেহের ওপর।

বনহুরের প্রচন্ড আক্রমণে ওরা বিক্ষিপ্তভাবে হুমড়ি খেয়ে এ ওর ওপর পড়তে লাগলো।

বনহুর ওপাশ থেকে একটা রড তুলে নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে সবাইকে আঘাতের পর আঘাত করে চললো। দুর্ধর্ষ বনহুরের সংগে ওরা কিছুক্ষণ লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত পারলো না, পরাজিত হলো।

যে কজন মুখোশধারী ছিলো তারা প্রায় সবাই বনহুরের হাতের রডের আঘাতে ভূতলশায়ী হলো। কয়েকজন সংগে সংগে মৃত্যুবরণ করলো।

বনহুর একজনকে জীবন্ত পাকড়াও করলো।

নরশয়তানের দলের সংগে যখন বনহুর তীব্রভাবে লড়াই করছিলো তখন মোহসিন টেবিল থেকে নেমে পড়ে মুক্ত পা দুখানা দিয়ে ভূতললুণ্ঠিত ব্যক্তিদের বুকে-পিঠে আঘাত করছিলো।

বনহুর ঐ ব্যক্তিকে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে তার মুখের মুখোস খুলে ফেলে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি হলেও চিনতে বাকি রইলো না, বিদেশী লোক ওরা। এখানে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এ হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে তা বুঝতে পারে না বনহুর।

লোকটাকে বনহুর টেনে টেবিলে তুলে শুইয়ে দেয়–তারপর কঠিন কণ্ঠে বলে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এভাবে নিরীহ লোকদের হত্যা করে চলেছে বলো নইলে যে অস্ত্র দ্বারা তোমরা এই লোকগুলোকে হত্যা করেছে সেই অস্ত্রে তোমার মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।

ওরা বিদেশী তাই বনহুর ইংরেজি ভাষায় কথাগুলো বললো যেন সে তার কথা বুঝতে পারে।

লোকটা ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলো, কারণ সে ভাবতেও পারেনি এমনভাবে কেউ তাদের সব শ্রম বিনষ্ট করে দেবে। ভীতভাবে বনহুরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলো লোকটা, এবার বললো—তুমি কে?

ওর কথায় বললো বনহুর—আমি তোমার যমদূত।

লোকটার মুখে এই মুহূর্তে কোনো মুখোস বা আবরণ না থাকায় তার মুখমন্ডল ভালভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, লোকটার চোখমুখে একটা বিস্ময়কর ভাব ফুটে উঠেছে, বললো–তুমি যমদূত!

হা। তোমাকে আমি তোমাদের এই মেশিনের ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করবো।

তুমি আমাকে হত্যা করবে?

হাঁ

তুমি কে আর এখানে কেমন করে এলে? কি চাও তুমি?

আমি কে এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি। এসেছি কেমন করে তা নাই বা শুনলে। আর কি চাই তা বুঝতেই পারছো তোমাদের হত্যা করতে চাই যেমনভাবে তোমরা নিরীহ মানুষগুলোর মস্তক ছেদন করেছে। তোমরা কেন এ হত্যালীলা চালিয়ে চলেছো বলো?

যদি আমাকে হত্যা না করো তবে বলবো।

সঠিক এবং সত্য কথা বলবে, মিথ্যা বললে আমি তোমাকে হত্যা না করে ছাড়বো না।

লোকটা টেবিলে উঠে বসেছে।

বনহুর সুইচ থেকে হাতখানা সরিয়ে নিলো।

ততক্ষণে যারা আশেপাশে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলো বনহুর আর টেবিলে বসা তাদের নিজের লোকটার দিকে। হঠাৎ কি ঘটে গেলো তা তারা ঠিক অনুধাবন করতে পারছিলো না। অনেক দিন থেকে তারা এই অজানা গভীর জঙ্গলের অভ্যন্তরে গোপন আড়াখানা তৈরি করে নিয়েছিলো। যেখানে কোনোদিন কেউ আসবে না তাদের কাজে বাধা দিতে।

লোকটার বুকের কাছে বনহুর চেপে ধরলো একটি ধারালো ছোরা। ছোরা খানা বনহুর ওপাশের একটা টেবিল থেকে তুলে নিয়েছিলো, ঐ ছোরা দ্বারাই বনহুর সবাইকে আতঙ্কিত করে তুললো। কারণ ছোরা টেবিলে বসা লোকটার বুকে চেপে ধরে রাখলো।

কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর—যদি বাঁচতে চাও তবে সত্যকথা বলো? বলো কেন লোকগুলোকে এভাবে তোমরা হত্যা করে বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রাখো?

বনহুরের হাতে উদ্যত ছোরার মুখে লোকটার মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, বললো—আমাদের দলপতির নির্দেশ আমরা পালন করে চলেছি।

দলপতির নির্দেশে তোমরা এই জঘন্যতম কাজ করে চলেছো? তোমাদের উদ্দেশ্য কি তোমাকে বলতে হবে।

উদ্দেশ্য আমরা জানি না। দলপতির আদেশ পালন করে চলেছি। পারিশ্রমিক পাই এক একটি নরমুন্ডের জন্য একশ’ স্বর্ণমুদ্রা। আমার জীবন নাশ করলে তুমি রেহাই পাবে না তুমি……

লোকটার কথা শেষ হয় না, হঠাৎ একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো লোকটার বুকে। একটা তীব্র আর্তনাদ করে ঢলে পড়ে লোকটা টেবিলের ওপরে।

বনহুর চট করে ফিরে দাঁড়ায়।

দেখতে পেলো একটা মুখোশ পরা লোক সরে গেলে আড়ালে।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলো।

প্রবেশ করলো যে কক্ষে ছোরা নিক্ষেপকারী প্রবেশ করেছিলো সেই কক্ষের মধ্যে। বনহুর দেখলো তার সামনে আবছা অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গপথ। বনহুর ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো। একটু ভেবে নিলো সে, তার দক্ষিণ হাতে ছোরাখানা রয়েছে।

বনহুর সুড়ঙ্গপথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চললো।

সিঁড়ি পথ।

অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে বনহুর কয়েকবার হোঁচট খেলো। বনহুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁজে ফিরছে সেই লোকটাকে যে লোকটা ছোরা নিক্ষেপ করে ঐ লোকটাকে হত্যা করলো।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বনহুরকে আক্রমণ করলো। চেপে ধরলো বনহুরের মুখ।

বনহুর কৌশলে তাকে সামনে টেনে নিলো। প্রস্তুত ছিলো বনহুর, অদ্ভুত এ সুড়ঙ্গপথে নানা বিপদ ওৎ পেতে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তাকে আক্রমণ করতে পারে।

বনহুর আক্রমণকারীকে সামনে টেনে নিতেই দেখলো এ সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ছোরা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলো টেবিলের ঐ লোকটাকে। বনহুর লোকটাকে আক্রমণ করলো।

লোকটার হাতেও ছিলো একখানা ধারালো ছোরা।

উভয়ে ছোরা নিয়ে শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

লোকটার মুখে তখনও মুখোশ রয়েছে।

ছোরাখানা সে বনহুরের বুকে বসিয়ে দেয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুর বা হাতে লোকটার ছোরাসহ হাতখানা সবলে চেপে ধরে রাখলো। ইচ্ছা করলে বনহুর নিজ হস্তস্থিত ছোরাখানা বসিয়ে দিতে পারে লোকটার বুকে, কিন্তু সে নিজকে সংযত রেখে যুদ্ধ করছে। হত্যার পূর্বে বনহুর দেখতে চায় লোকটাকে।

বনহুরের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। লোকটার দক্ষিণ হাতের ছোরাখানা বনহুরের বলিষ্ঠ মুঠার চাপে খসে পড়লো।

এবার বনহুর নিজের হাতের ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো লোকটার বুকে।

অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো লোকটার মুখ থেকে। বনহুর একটানে খুলে ফেললো ওর মুখের মুখোশখানা।

বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো বনহুর এক চক্ষুবিহীন একটা ভয়ংকর মুখ। জমকালো তার চেহারা, দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে ঠোঁটের ওপর।

বনহুর দেখলো লোকটার বুকে ছোরাবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুবরণ করেছে। আশেপাশে কোনো লোক দেখা গেলো না। বনহুর বুঝতে পারলো এই ব্যক্তিই দলপতি ছিলো। দলপতি নিহত হলো, কাজেই এই মস্তকবিহীন ঝুলন্ত লাশগুলোর হত্যারহস্য উদঘাটন হলো না।

ফিরে এলো বনহুর মোহসিনের পাশে।

দ্রুতহস্তে মোহসিনের বন্ধন মুক্ত করে দিলো বনহুর, তারপর বললো–চলল, এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না। দলপতিকে হত্যা করেছি, কাজেই এ হত্যালীলার সমাধান ঘটেছে, যদিও হত্যা রহস্য রহস্যাবৃতই রয়ে গেলো।

বনহুর আর মোহসিন বেরিয়ে এলো সেই ভূগর্ভের রহস্যময় স্থান হতে।

*

বসে ছিলো জাভেদ একটা টিলার ওপরে।

দৃষ্টি তার সামনে সীমাহীন সাগরের পানির দিকে। প্রচন্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে তার পায়ের কাছে। কি ভাবছে জাভেদ সেই জানে।

আজকাল জাভেদ বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। তার চোখ দুটো বড় সুন্দর আর নীল, দৃষ্টি যেন সদা কিছু খুঁজে ফিরছে। প্রায়ই সে নির্জনে এসে বসে ভাবে কিছু।

নূরীর মন চিন্তায় অস্থির।

জাভেদ তার একমাত্র সন্তান, সে যদি এমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তাহলে মায়ের মন কিছুতেই সংযত থাকে না! নূরী জানে, এ বয়সে ছেলেরা বড় চঞ্চল হয় কিন্তু জাভেদ কেন এমন হলো। বেশি তার ভাবনা ফুল্লরার জন্য। নূরী নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ফুল্লরার ব্যথা। কারণ একদিন নূরীও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো বনহুরকে কিন্তু বনহুর তার প্রতি ছিলো সম্পূর্ণ উদাসীন। নূরীর প্রতি তার ছিলো না কোনো আকর্ষণ। যদিও শিশুকাল হতে ওরা দুজন ছিলো দুজনের সাথী। একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে, এক সাথে নদীতে সাঁতার কেটেছে, একসঙ্গে বনে বনে ঘুরে শিকার করেছে। কত মিল ছিলো বনহুর আর তার মধ্যে, তবুও কেমন যেন ধরাছোঁয়ার বাহিরে ছিলো বনহুর। মাঝে মাঝে নূরী রাগে-অভিমানে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতে। বনহুর দেখেও দেখত না, হয়তো বুঝতেও পারতো না কেন নূরীর চোখে পানি। নূরী রাগ করে কতদিন ওর সঙ্গে কথাও বলেনি। তবু একটু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি বনহুরের মধ্যে। তারপর অনেক সাধনার ফল হিসেবে পেয়েছে নূরী বনহুরকে। তাই নূরী ভয় পায় ফুল্লরা জয়ী হবে কিনা।

যখন নূরী ফুল্লরা আর জাভেদকে পাশাপাশি দেখে তখন তার মনটা আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে। প্রাণভরে তাকিয়ে দেখে এমনি করে যদি ওরা একত্রিত হয়ে যেতো!

জাভেদ কিন্তু মাকে নিয়ে মোটেই ভাবে না। ভাবে না সে ফুল্লরার কথা। সব সময় সে বেখেয়াল বেপরোয়া।

প্রায়ই সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, কখনো পাহাড়ে-পর্বতে, কখনও বা সাগরতীরে। সাথী তার জাম্বু, জাম্বুর পিঠে চেপে জাভেদ বিচরণ করে ফেরে। বন্য জীবজন্তু তার বন্ধু, সব রকম হিংস্র জন্তু তার বশে।

জাভেদ ভালবাসে বনের পশুদের। পশুরাও ভালবাসে জাভেদকে। জাভেদ পেয়েছে পিতার স্বভাব, বনহুর ছিলো বনের রাজা তাই পশুরাজও ছিলো তার বাধ্য। বনহুর সিংহ শাবকের সঙ্গে খেলা করতে, সিংহ তাকে দেখে ভয় পেতত,

সিংহী আদর করতো। তেমনি জাভেদ সিংহ আর ব্যাঘ্র কাউকেই ভয় পায় না যত হিংস্রই হোক না কেন। মাঝে মাঝে লড়াই যে হয় না ওদের সংগে তা নয়। হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে প্রায়ই তাকে মোকাবেলা করতে হয়।

দেহের বহুস্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে জাভেদের।

ফুল্লরা তাই সব সময় ওকে নিয়ে চিন্তা করে, দৃষ্টির আড়ালে গেলেই ভয় হয় না জানি কখন কোন বিপদ বাধিয়ে বসবে কে জানে।

জাভেদ বসে ছিলো আনমনে।

পেছন থেকে ফুল্লরা এসে ওর চোখ দুটো ধরে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ ওকে ধরে ফেললো এবং টেনে নিলো সামনে।

ফুল্লরা হেসে উঠলো খিল খিল করে।

জাভেদ এবার ফুল্লরাকে তুলে নিলো হাতের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলো জাভেদ। টিলার উপরে ওরা, নিচে সাগরের জলরাশি।

বাতাসে আঁচল উড়ছে ফুল্লরার।

জাভেদ বললো—সাগরের জলে ফেলে দেই তোমাকে?

ফুল্লরা ওর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে বললো—-পারবে না আমাকে ঐ সাগরে নিক্ষেপ করতে।

সত্যি পারবে?

না, পারবে না।

ফুল্লরার কথা শেষ হতে না হতেই জাভেদ ফুল্লরাকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরবক্ষে। ডুবসাঁতার কেটে ধরে ফেললো ফুল্লরাকে।

প্রচন্ড ঢেউগুলোকে প্রতিহত করে জাভেদ ফুল্লরাকে তুলে নিলো পিঠে, তারপর সাঁতার কেটে এগিয়ে এলো তীরের দিকে।

তীরের কাছাকাছি এসে বললো ফুল্লরা–মেরে ফেলবে বলে তুমি আমাকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করলে, আবার উদ্ধার করলে কেন?

জাভেদ কোনো জবাব দিলো না।

ফুল্লরা তখনও ওর কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে আছে। তাকালো সে জাভেদের চোখ দুটোর দিকে। ওর চোখ দুটো যেন সর্দারের চোখ! সেই মুখ, সেই ললাট সেই প্রশস্ত বক্ষদেশ। বললো ফুল্লরা জাভেদ, তুমি সর্দারের ছেলে হয়ে এত নিষ্ঠুর! সর্দার তোমার মত এমন কঠিন নয়। তুমি মাঝে মাঝে আমার ওপর এমন অবিচার করো কেন?

জাভেদ ওকে নামিয়ে দিলো।

রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছিলো জাভেদ, কারণ প্রচন্ড ঢেউ ঠেলে ফুল্লরাকে নিয়ে সাঁতার কেটে তীর অবধি আসা কম কথা নয়।

ফুল্লরা বসে পড়ে, তারপর টেনে জাভেদকেও বসিয়ে দেয় নিজের পাশে।

সাগরের উচ্ছল জলরাশি ছুটে আসে, আছড়ে পড়ে জাভেদ আর ফুল্লরার শরীরের ওপর।

ফুল্লরা আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় জাভেদের চোখেমুখে।

জাভেদ দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলে।

ফুল্লরা বলে–আমাকে তুমি সাগরে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে চেয়েছিলে? আমি মরতাম, তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?

জাভেদ কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ফুল্লরাও উঠে পড়লো।

সাগরের উচ্ছল ঢেউগুলো তাদের পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে পড়ছে।

জাভেদকে ধরে ফেললো ফুল্লরা-না, তোমাকে যেতে দেবো না। চলো ফিরে যাই। বাড়িতে। জানো আমার অশ্ব নিয়ে সারাটা দিন ধরে তোমাকে খুঁজেছি। জাভেদ, তোমার জাম্বুকে টিলার নিচে দেখতে পেয়ে আমার অশ্বটিকে জাম্বুর পাশে রেখে ওপরে উঠে। গিয়েছিলাম। সত্যি তুমি বড় নিষ্ঠুর…একটুও কি তোমার দয়া-মায়া নেই? আমার প্রতি তোমার কি কোনোদিন করুণা হবে না?

জাভেদ ফুল্লরার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকায়, সে বুঝি ওর হৃদয়ের গভীরে সন্ধান করে ফেরে। ডুবুরী যেমন সাগরতলায় মুক্তার সন্ধান করে তেমনি।

জাভেদ আর ফুল্লরা এক সময় তাদের অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো। জাম্বু আর শিবলী দুটি অশ্ব দুজনের, ফুল্লরার আর জাভেদের। ওরা দুজন নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অশ্বপৃষ্ঠে চাপার সময় জাভেদ ফুল্লরাকে সাহায্য করলো। অশ্বটি অত্যন্ত উঁচু ছিলো তাই তার পিঠে চাপতে ফুল্লরার বেশ অসুবিধা হতো। প্রায়ই জাভেদ এ ব্যাপারে ফুল্লরাকে সহযোগিতা করতো। ফুল্লরার মনে তখন খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে যেতো। ইচ্ছা করেই কতদিন ফুল্লরা অশ্ব থেকে পড়ে যাবার ভান করেছে। জাভেদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে গেছে, দুহাত বাড়িয়ে ধরেছে ফুল্লরাকে।

আড়ালে গিয়ে হেসেছে ফুল্লরা।

জাভেদ বড় সরল সহজ, তাই সে সব সময় ফুল্লরার কাছে বোকা বনে যায়।

বনজঙ্গল পেরিয়ে জম্বু আর শিবলী ছুটে চলেছে।

হঠাৎ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো একদল দস্যু। তাদের হাতে বর্শা আর বল্লম।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো জাভেদ আর ফুল্লরা তাদের অশ্ব নিয়ে।

দস্য সর্দার তার অনুচরদের ইংগিত করলো ঘেরাও করে ফেলার জন্য, মুহূর্তে ওরা জাভেদ আর ফুল্লরার অশ্বের চারপাশে বর্শা উদ্যত করে দাঁড়ালো। যেন একচুল এগুতে না পারে জাভেদ ও ফুল্লরা।

দস্যু সর্দারের নির্দেশে কয়েকজন দস্যু ফুল্লার অশ্বটিকে ঘিরে ধরে ফুরাকে নামিয়ে নিলো।

এ দৃশ্য জাভেদকে বিচলিত করলো।

সে ঝাঁপিয়ে পড়লো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে দস্যুদের ওপর। একজনের হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ চালালো জাভেদ।

কয়েকজন দস্যু নিহত হলো জাভেদের হাতে।

যারা ফুল্লরাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো এবার জাভেদ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক একজনকে প্রচন্ড ঘুষি লাগিয়ে কাহিল করে ফেললো। ফুল্লরাকে মুক্ত করে নিলো জাভেদ।

কিন্তু দস্যু সর্দার তখনও জখম হয়নি।

তার দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছে যেন।

লোকটার বিকট চেহারা, দুচোখ রক্তের মত লাল। ঠোঁট দুটোতে কুৎসিত ক্ষত-চিহ্ন। চোয়ালে কাটার দাগ। ওকে দেখলে বড় ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়।

দস্যু সর্দার এবার জাভেদকে আক্রমণ করলো।

প্রথমে সে জাভেদকে গ্রাহ্যই করলো না। জাভেদের মত বয়সী তরুণকে সে কমই কেয়ার করে। সে ভাবলো ওকে কাবু করা মোটেই কষ্টকর নয়। তারপর যখন নিজ অনুচরগণ ঐ তরুণটির কাছে একের পর এক পরাজিত হলো তখন দস্যু সর্দার নিজে আক্রমণ করলো জাভেদকে।

দস্যু সর্দার জাভেদকে আক্রমণ করার পরই টের পেলো যত সহজ মনে করেছিলো তত সহজ নয়। ভীষণ লড়াই হলো দস্যু সর্দারের সঙ্গে জাভেদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই দস্যু সর্দার পরাজয় বরণ করলো। জাভেদের বর্শার আঘাতে নিহত হলো।

যারা দুচারজন ছিলো তারা সর্দারের শোচনীয় মৃত্যু লক্ষ করে পালিয়ে গেলো।

ফুল্লরা এসে জাপটে ধরলো জাভেদকে।

আজ জাভেদ যদি তার পাশে না থাকতো তাহলে ফুল্লরা নিস্তার পেতো না ঐ দস্যু সর্দারের কবল থেকে। উচ্ছল কণ্ঠে বললো ফুল্লরা-জাভেদ...আমার জাভেদ......

তাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কতকগুলো লাশ। কারও বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে বর্শার সূতীক্ষ্ণ ধারালো ফলক। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে বনভূমির শুকনো মাটি।

ফুল্লরা বললো—জাভেদ, চলো, এ দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বললো জাভেদ—চলো। চলো ফুল্লরা......

ফুল্লরা অবাক হয়ে তাকালো জাভেদের মুখের দিকে। সে যেন জাভেদের কণ্ঠস্বরে নতুন এক সুর শুনতে পেলো। খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো ফুল্লরার মুখমন্ডল, ওর বুকে মাথা রাখলে ফুল্লরা।

জাভেদ ফুল্লরাকে তার অশ্বপষ্ঠে বসিয়ে নিয়ে জাম্বুর পিঠে চেপে বসলো।

*

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো নূরী আর নাসরিন। জাভেদ আর ফুল্লরা গেলো কোথায়। ওরা না বলে চলে গেছে, কতদূর গেছে কে জানে।

নূরী আর নাসরিন ওদের নিয়ে যখন ভাবছে তখন তারা শুনতে পেলো অশ্বখুরের শব্দ। বুঝতে পারলো জাভেদ আর ফুল্লরা ফিরে আসছে। জাম্বু আর শিবলীর খুরের আওয়াজ বুঝতে পারে তারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নূরী আর নাসরিন দেখতে পেলো জাভেদ আর ফুল্লরা তাদের নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ফিরে এসেছে।

ফুল্লরা অশ্বপষ্ঠ থেকে নেমে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো নাসরিনকে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো–আম্মি, আজ আমার খুশির দিন...আজ আমার খুশির দিন...মাকে ছেড়ে দিয়ে আবার নূরীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে ফুল্লরা–মা মনি, তোমার ছেলের স্মৃতি ফিরে এসেছে, সে আমাকে চিনতে পেরেছে...

নূরী আর নাসরিনের চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। জাভেদের শরীরে রক্তের ছাপ। স্থানে স্থানে ক্ষত চিহ্ন। ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরছে। হতবাক হয়ে পড়েছে নূরী, হঠাৎ ফুল্লরার চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখে আরও অবাক হয়েছে ওরা।

ফুল্লরার মুখে হাসি ছিলো না। সব সময় সে কেমন মনমরা হয়ে থাকতো। ভাল করে কথা বলতো না; তেমন করে কারও পাশে বসতো না। সব সময় কিছু ভাবতো। কি ভাবতো প্রকাশ না করলেও বুঝতে পারতো নূরী আর নাসরিন। ফুল্লরার মুখে হাসি ফুটানোর জন্য কত না চেষ্টা করতো নাসরিন আর নূরী।

খুশির উচ্ছ্বাস আজ ফুল্লরাকে উচ্ছল করে তুলেছে।

নূরী কিছু বুঝতে না পেরে ছুটে গিয়ে জাভেদকে ধরে ফেলে, তারপর সমস্ত চোখেমুখে হাত বুলিয়ে বলে কি হয়েছে? কি হয়েছে বাবা জাভেদ তোর? সমস্ত শরীরে ক্ষত...

জাভেদ আজ অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দস্যুদের প্রচুর রক্তপাত আর হত্যালীলা তার মনের মধ্যে একটা প্রচন্ড আলোড়ন, তার সমস্ত শরীরের মাংসপেশী আর ধমনির শিরা উপশিরায় নাড়া দিয়েছিলো। স্বাভাবিক সম্বিৎ ফিরে আসে জাভেদের। সন্ন্যাসী বাবার দেয়া ওষুধের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়। সচ্ছ হয়ে আসে জাভেদের মস্তিষ্ক। বহুদিন পর মায়ের মুখ সে চিনতে পারে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে জাভেদ—আম্মু...আম্মু!

হাঁ, হাঁ, বাবা আমি! আমি তোমার মা....

জাভেদ মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে বলে–আম্মু....আম্মু, আমার আম্মু...

ঐ মুহূর্তে বনহুর আর মোহসিন এসে পৌঁছলো সেখানে, এ দৃশ্য বনহুর আর মোহসিনকে বিস্মিত করলো।

নূরী স্বামীর পাশে ছুটে এসে বললো, আমার জাভেদ আমাকে চিনতে পেরেছে, ওর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এসেছে...

বনহুর তাকালো জাভেদের দিকে।

জাভেদ বনহুরকে লক্ষ করছিলো। ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মুখ নত করে নিলো জাভেদ।

বনহুর দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—জাভেদ...।

জাভেদ আর মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারলো না, ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে।

নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে মোহসিন, এ দৃশ্য তাকে বিমুগ্ধ করলো।

নূরী, নাসরিন, ফুল্লরা তাদের চোখে মুখেও খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে। পিতা-পুত্রের এ মিলন দৃশ্য সবাইকে অভিভূত করে তোলে। বনহুর গভীর আবেগে জাভেদকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে আদরমাখা শান্তকণ্ঠে বলে–জাভেদ, তোমার মায়ের বাসনা পূর্ণ করো।

*

সেদিন থেকে বনহুরের আস্তানায় নতুন আনন্দ উৎসব বয়ে চললো। হাসি-খুশিতে উচ্ছল ফুল্লরা। সব সময় ফুল্লরা জাভেদকে নিয়ে স্বপ্নজাল বুনে চলে। কারণে-অকারণে এসে ওকে মাতিয়ে রাখতে চায়।

জাভেদ স্বাভাবিক সংজ্ঞা ফিরে পেলেও সে উচ্ছল হলো না, একটা গাম্ভীর্য তাকে আরও ধৈর্যশীল করে তুললো।

সেদিন তীর-ধনু নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলো জাভেদ, ঠিক এই সময় ফুল্লরা এসে পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে-কোথায় যাচ্ছো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

জাভেদ একটু হেসে বলে–সেদিনের বিপদের কথা ভুলে গেলে এরি মধ্যে?

ভুলিনি বরং সেদিনের বিপদ আমার জীবনে এনেছে নতুন এক পরিবর্তন। জাভেদ আমি ফিরে পেয়েছি তোমাকে।...বলো তুমি আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে?

ফুল্লরা, বহুদূরে যাবো, সেখানে তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। বললো জাভেদ।

ফুল্লরা বললো–কোনো কথা শুনবো না জাভেদ। আজ আমি যাবো তোমার সঙ্গে।

বেশ চল। বললো জাভেদ।

জাম্বুর পাশে এসে দাঁড়ালো ওরা দুজন।

জাম্বুর ভীষণ আর ভয়ংকর চেহারা ফুল্লরাকে মাঝে মাঝে ভীত করে তুললো। বহুদিন বলেছে ফুল্লরাজাম্বু ছাড়া তোমার কি অন্য কোনো অশ্ব পছন্দ হয় না?

জাভেদ কোনো উত্তর দিতো না।

আজ বললো জাভেদ—ফুল্লরা, জাভেদের পিঠে চাপতে তোমার ভয় হবে না।

না, কারণ তুমি থাকবে পাশে।

বেশ চলো।

জাভেদ ফুল্লরাকে তুলে বসিয়ে দিলো জাম্বুর পিঠে, তারপর নিজেও চেপে বসলো।

জাভেদের পিঠে তীর ধনু বাধা।

উল্কাবেগে ছুটলো জাভেদ আর ফুল্লরাকে নিয়ে অশ্ব জাম্বু।

কান্দাই জঙ্গল ভীষণ আর ভয়ংকর জঙ্গল। যার অভ্যন্তরে দস্যু বনহুরের আস্তানা। এমন ঘন গভীর জঙ্গল এ তল্লাটে আর নেই। কান্দাই জঙ্গলের একপাশে কান্দাই পর্বত।

সুউচ্চ কান্দাই পর্বতের এক একান্ত গোপন স্থানে বনহুরের গুপ্ত গুহা। এখানে গভীর মাটির তলায় আছে বন্দীশালা যার সন্ধান বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচরগণ ছাড়া আর কেউ জানে না।

বনহুর মাঝে মাঝে এই গুহায় এসে সবকিছু পরিদর্শন করে। এ গুহা লোকচক্ষুর অন্তরালে, এখানে সূর্যের আলো প্রবেশের ক্ষমতা নেই। এখানে কোনো এক গুপ্ত-গুহায় বনহুরের ধন-সম্পদের তিন ভাগ জমা আছে। হীম সাগরের তলদেশ থেকে যে ধনসম্পদ বনহুর উদ্ধার করেছিলো তা জমা আছে এখানে।

বনহুর তার সহকারী রহমানসহ এই গুহায় যায় এবং এখানে তাদের গোপন আলোচনা চলে। কি আলোচনা হয় তা আর কেউ জানতে পারে না শুধু রহমান এবং অন্য দুচারজন অনুচর ছাড়া।

এমন কি জাভেদ বা ফুল্লরাও জানে না বনহুর মাঝে মাঝে কোথায় অন্তর্ধান হয়। আজ জাভেদ আর ফুল্লরা সেই পথ দিয়েই অশ্ব ছুটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

কান্দাই পর্বতের ওপাশেই বিস্তৃত প্রান্তর, মাঝে মাঝে প্রস্তর খন্ড ছড়িয়ে আছে।

শাল আর ঝামগাছের ভিড় দেখা যায় স্থানে স্থানে।

বনহুর আর রহমান কোনো কারণে তাদের এই গোপন গুহায় এসেছিলো। হঠাৎ এ পথে অশ্বপদশব্দ শুনে বনহুর দেখতে পেলো জাম্বুর পিঠে জাভেদ ও ফুল্লরা।

উভয়ে তাকালো উভয়ের মুখের দিকে।

একটা আনন্দপূর্ণ ভাব ফুটে উঠলো তাদের চোখেমুখে। এতদিন বনহুর নূরীর মুখে শুনে এসেছে জাভেদ মোটেই ফুল্লরাকে পাত্তা দেয় না। ওর সান্নিধ্য সহ্য করতে পারে না সে। আর আজ তারা একই অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করে ফিরছে, এটা খুশির কথা।

রহমান বললো—-জাভেদ রাহুমুক্ত হয়েছে। সন্ন্যাসীর ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে গেছে।

হাঁ রহমান, এবার আমি নিশ্চিত হয়েছি এ ব্যাপারে, তবে একটা চিন্তা আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে তা হলো হুমায়রার চিন্তা। হুমায়রা কোথায় হারিয়ে গেলো আর তাকে কেউ খুঁজে পেলো না…একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বনহুরের বুক চিরে।

রহমান বললো—চলুন সর্দার।

হাঁ চলো। বনহুর আর রহমান পা বাড়ালো।

জাভেদ আর ফুল্লরার অশ্ব ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

জাভেদ আর ফুল্লরা তাদের অশ্ব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বন বাদাড় ছাড়িয়ে বহুদুর এসে পড়ে তারা। ফুল্লরা বলে—চলো, এবার আস্তানার পথে ফেরা যাক?

জাভেদ বলেনা ফিরবো না।

সত্যি আমার ভয় করছে।

তাহলে এলে কেন?

তুমি এতো দূরে চলে আসবে আমি তা ভাবতে পারিনি। তোমার জাম্বু পক্ষীরাজ ঘোড়া-মুহূর্তে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে পারে। দেখছোনা কোন্ অজানা দেশে আমাদের নিয়ে এলো?

জাভেদ আর ফুল্লরা নেমে পড়লো অশ্ব থেকে।

একটা নতুন দেশ।

নতুন পথ।

সবই নতুন।

জাভেদ আর ফুল্লরা একটি গাছের তলায় বসে পড়লো। চারদিকে জনশূন্য বিস্তৃত প্রান্তর। স্থানে স্থানে শালবন আর উঁচুনীচু পাথরের স্তূপ।

একটি পথ চলে গেছে শালবনের পাশ দিয়ে।

আকাশ মেঘমুক্ত।

অজানা পাখির দল ফিরে চলেছে নিজ নিজ বাসায়। ফুল্লরা বললো—এবার আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।

কেন। বললো জাভেদ।

ফুল্লরা বললো—সন্ধ্যা হয়ে এলো, বনে নানা রকম বিপদ আসতে পারে।

জাভেদ বিপদকে ভয় পায় না। তোমার যদি এত ভয় তবে এলে কেন?

তুমি বড় খেয়ালী! তীর-ধনু নিয়ে বের হলে, কই শিকার তো করলে না কিছু?

শিকার।

হাঁ, কত সুন্দর সুন্দর হরিণ আছে, কত পাখি আছে, কই কিছুই তুমি শিকার করলে না?

ইচ্ছে হলো না তাই শিকার করলাম না!

তুমি যে কেমন। তোমার মধ্যে যেন প্রাণ নেই।

আমি কি তবে মৃত?

কতকটা তাই। বললো ফুল্লরা।

জাভেদ বললো—আমার শিকার করতে ভাল লাগে না। জীবজন্তুগুলো আমার বন্ধু।

আর আমি তোমার কেউ নই?

তুমি, তুমিও আমার বন্ধু…কথাটা বলে একটু হাসলো জাভেদ।

ফুল্লরা ওর কণ্ঠদেশ জড়িয়ে ধরে বললো–সত্যি বলছো আমি তোমার বন্ধু? বলো, আর একবার বলো?

জাভেদ কোনো কথা না বলে উঠে দাঁড়ালো।

ফুল্লরাও উঠে পড়লো ওর সঙ্গে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

ফুল্লরা বললো–চলো এবার ফেরা যাক।

জাভেদ জাম্বুর দিকে তাকিয়ে বললো—এ বড় ক্লান্ত, আর একটু বিশ্রাম করে নিক।

কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমার বড় অস্বস্তি লাগছে, সেদিনের মত যদি কোন....

আমি তোমার পাশে আছি, ভয় কিসের তোমার?

সত্যি, সত্যি বলছো জাভেদ

জাভেদ তখন জাম্বুর পাশে এসে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। ফুল্লরার কথায় কোনো জবাব দিলো না।

ফুল্লরা অভিমানে মুখ ভার করলো।

কিন্তু জাভেদ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। জাভেদের কোনোদিকে খেয়াল করার মত সময় যেন ছিলো না। সব সময় সে আপন খেয়ালে বিভোর থাকে। কতদিন পর সে স্বাভাবিক সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে, কত আনন্দ ফুল্লরার। এখন জাভেদ তার জীবনকে হাসি গানে ভরিয়ে তুলবে, কতকথা বলবে সে, ফুল্লরার সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইবে। কিন্তু জাভেদ সংজ্ঞা ফিরে পেলেও তেমনি পূর্বের মতই রইলো। ফুল্লরার প্রতিই শুধু সে উদাসীন নয়, উদাসীন সে নিজের প্রতিও।

ফুল্লরা আবার বললো—চলো জাভেদ এবার ফিরে যাই।

জাভেদ বললো—চলো।

ফুল্লরাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দিলো জাভেদ তারপর নিজে অশ্বে চেপে বসলো।

জাম্বু এবার ছুটতে শুরু করলো তীরবেগে।

জাভেদের বুকে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ফুল্লরা নিশ্চিন্তভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসে রইলো। জাভেদ ফুল্লরাকে বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাতে জাম্বুর লাগাম চেপে ধরেছিলো। জাম্বু ছুটে চলেছে। বনবাদাড় পেরিয়ে, জনশূন্য প্রান্তর পেরিয়ে কান্দাই জঙ্গলে প্রবেশ করে জাম্বু।

রাত তখন গভীর।

জাম্বুর কাছে রাতের অন্ধকার কিছুই নয়। তেমনি জাভেদ আর ফুল্লরাও। ওরা রাতের অন্ধকারে বিচরণ করতে ভালবাসে।

তাই ওরা জাম্বুর পিঠে চলতে একটু কষ্ট বোধ করছে না বরং ফুল্লরার মনে সীমাহীন আনন্দ। জাভেদের বাহুবন্ধনে নিজের সমস্ত সত্তাকে ফুল্লরা বিলিয়ে দিতে চায়।

*

সর্দার, ফিরো শহর থেকে আমাদের গুপ্তচর মশিউর সংবাদ পাঠিয়েছে সেখানে রাজা মহাতাক শিবাজী প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে চলেছে। প্রতিদিন একটি সুন্দরী কন্যা তার চাই। এ ছাড়া প্রজাদের ওপর তার যে নিষ্পেষণ তা কল্পনাতীত। কথাগুলো বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো কায়েস।

বনহুর তার রাইফেলটা পরিষ্কার করছিলো। কায়েসের কথাগুলো শুনে চোখ তুলে তাকালো।

কায়েস বললো আবার–সর্দার, আপনার কাছে এ সংবাদ জানানোর পূর্বে আমরা নিজেরা রাজা মহাতাক শিবাজীকে সংশোধন হওয়ার জন্য সাবধান করে দিয়েছি।

তাতে কি ফল হয়েছে? বললো বনহুর।

কায়েস বললো—ফল আরও জঘন্য পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই আপনাকে বলতে বাধ্য হলাম আমরা।

বনহুর আপন মনে বলে উঠলো—-ফিরো শহর…রাজা মহাতাক শিবাজী… ঠিক আছে। শোন কায়েস, কান্দাইয়ের রথী-মহারথী স্বনামধন্য ব্যক্তি যারা ছিলেন তাদের সংবাদ কি?

সংবাদ গুরুতর সর্দার। অনেক দিন আপনি আস্তানায় না থাকায় অনেক সংবাদ আপনি অবগত নন। নতুন সরকার দেশরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর দেশের দুষ্ট লোকদের সায়েস্তা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

বনহুর বললো–হাঁ, রহমানের মুখে কিছু কিছু জানতে পেরেছি। দুর্নীতিবাজ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সায়েস্তা করা হচ্ছে তবে এখন নাকি কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি আত্মগোপন করেছে।

কায়েস বললো–আসনচ্যুত হলেও তাদের প্রাচুর্য কমেনি, কারণ পদাধিকার বলে তারা আখের গুছিয়ে নিয়েছিলো। আজ তারা মুখে সাধুতার মুখোস পরে সমাজের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। তবে সে আশা নিষ্ফল হবে কারণ সরকার অত্যন্ত সজাগ।

হাঁ, রহমান আমাকে এ ব্যাপারে জানিয়েছে। আমি জানি অন্যায় কোনোদিন টিকে থাকতে পারে না। কান্দাইবাসীর নীরব অশ্রুধারা বিফল যায়নি তবে এখনও কিছু নরপশুর দল গোপনে নিজেদের অসৎ ব্যবসা চালিয়ে যাবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

সর্দার, এরাও নিস্তার পাবে না।

হাঁ, সত্য কথা বলেছো কায়েস, কান্দাই সরকার যেভাবে অন্যায় অনাচার আর দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট তাতে ইনশাআল্লা দেশ ও দেশবাসী কিছু উপকৃত হবে।

সর্দার, দুষ্কৃতিকারী স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ, যারা কিছু দিন পূর্বেও বড় বড় বুলি আওড়িয়ে গদ গদ কণ্ঠে জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন আজ তারা…

থাক, আমি সব জানি কায়েস। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেই, রেহাই পাবে না কেউ।

সত্যি সর্দার, বলতেই লজ্জা পাই, এহেন নেতৃস্থানীয় অধিপতিগণ যারা এই কদিন পূর্বেও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন থেকে জনসেবায় ব্যস্ত ছিলেন তারাই আজ বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জনসমুদ্রের সামনে করজোরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে। এর চেয়ে এদের মৃত্যু ছিল অনেক শ্রেয়।

এ কথা যদি তারা একবার ভেবে দেখতো, ভেবে দেখতে দুর্নীতির পরিণাম কত অশোভনীয় তাহলে কেউ এ পথে পা বাড়াতো না। আজ যারা সৎ-মহৎ ব্যক্তি তারা নিজ নিজ আসনে সমাসীন থেকে সমাজে মাথা উঁচু করে আছেন। তাদের বুক ভরা সান্তনা, মনভরা আনন্দ উৎসব, তারা আজ নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হবার যোগ্য ব্যক্তি।

সর্দার, এরাও যখন গদিতে প্রথম বসেছিলো তখন এদের মান সম্মান, সুনাম ছিলো। জনসেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন লাভ করেছিলো। তারপর,

বলল, থামলে কেন কায়েস?

তারপর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ভুলে গেলে তাদের শপথের কথা, আসল রূপ উদঘাটন হলো, জনগণকে ধোকা দিয়ে আখের গোছাতে শুরু করলো, কিন্তু……

হাঁ, সীমা লংঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না, সীমা ছাড়িয়ে যখন তারা দুর্নীতির চরমে পৌঁছেছিলো তখন তারা তাদের কর্ম ফলের দায়ে দন্ডিত হলো……কান্দাই ব্যাপার নিয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিত।

সর্দার ফিরো শহরের ব্যাপারে শীঘ্র প্রস্তুতি নেয়া দরকার। রাজা মহাতাক শিবাজীর দুর্দান্ত দাপটে ফিরোবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারে আমি ভাবছি কায়েস।

আচ্ছা সর্দার।

কায়েস কুর্ণিশ জানিয়ে চলে যায়।

বনহুর মনোযোগ দেয় তার নিজের কাজে।

*

ফিরো শহর।

রাজা মহাতাক শিবাজীর বাগান বাড়ি।

এখানেই চলে নিরীহ জনগণের ওপর পাশবিক অত্যাচার। কষাঘাতে জর্জরিত করা হয় অসহায় প্রজাদের। সামান্য অপরাধে বন্দী করে আনা হয় তারপর বিনা কারণে চলে নির্মম অত্যাচার।

কত বৃদ্ধ কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রাণ হারায়।

তাদের প্রাণহীন দেহ টেনে ফেলে দেওয়া হয় বাগান বাড়ির অদূরে অন্ধকূপে। কেউ কোনো দিন সে কূপ থেকে ফিরে আসেনি, আসতে পারে না।

বাগানবাড়ির শেষ প্রান্তে এক অদ্ভুত ভয়ংকর জায়গা যেখানে এই অন্ধকূপ। এ অন্ধকূপ তৈরি করেছিলেন রাজা মহাতাক শিবাজীর পিতামহ রামেশ্বর শিবাজী। যদিও তিনি এই অন্ধকূপ তৈরি করে ছিলেন কিন্তু কাউকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ

করার মত মনোভাব তার হয়। নি। রাজা রামেশ্বর শিবাজীর মন ছিলো উদার মহৎ, অন্ধকূপ তার তৈরি হলেও তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহী হতে পারেননি। কোনো প্রজাকে দোষী সাব্যস্ত করলেও তাকে তিনি ক্ষমাই করে গেছেন। প্রজাগণ তাই তাকে দেবতার মত মনে করতেন। রাজা রামেশ্বর শিবাজীর পুত্র রাজা ধনেশ্বর শিবাজী ছিলেন ঠিক তার উল্টো। রাজসিংহাসনে উপবেশন করার পর তার প্রচন্ড দাপটে ফিরো রাজ্য থর থর করে কাপতো। কারণে-অকারণে প্রজাদের উপর চলতো পাশবিক অত্যাচার। এতটুকু অপরাধে হত্যা করা হতো প্রজাদের। নিক্ষেপ করা হতো অন্ধকূপে। তাছাড়াও নানা রকম উৎপীড়ন করা হতো দেশের জনগণের ওপর।

রাজা ধনেশ্বর শিবাজীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবেশন করলো রাজা মহাতাক শিবাজী। তার স্বভাব সম্পূর্ণ পিতার মতো হলো। রাজ্যশাসনে তার কোনো ন্যায়নীতি ছিলো না। রাজ্যের জনগণের ওপর অকথ্য অত্যাচার আর উৎপীড়ন করাই হলো তার স্বভাব।

কারণে-অকারণে প্রজাদের ধরে এনে তাদের ওপর নিষ্পেষণ চালানো হতো। রাজ্যের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা জীবনরক্ষার জন্য দেশত্যাগী হবে বলে অনেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

রাজা মহাতাক শিবাজীর এই অসকাজে সহযোগিতা এবং উৎসাহদানকারী হলো তার সহচর মন্ত্রিপরিষদ। রাজ্যের কোনো প্রজার সুন্দরী কন্যার সন্ধান পেলে তার বৃদ্ধ পিতা অথবা মাতা কিংবা আত্মীয়-পরিজনকে পাকড়াও করে এনে শাস্তি দেয়া হতো এবং বাধ্য করানো হতো তার সুন্দর কন্যাকে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসতে।

এমনি করে প্রতিদিন কত সতী নারীর সতীত্ব নাশ করে চলেছে রাজা মহাতাক শিবাজী তার কোনো হিসেব নেই। অহেতুক প্রজাদের পাকড়াও করে এনে তাদের ওপর চালানো হয় নির্মম অত্যাচার! যারা নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে তাদের নিক্ষেপ করা হয় অন্ধকূপে।

ফিরো রাজ্যের চারদিকে দারুণ আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতা বিরাজ করছে। না জানি কখন কার ভাগ্যে কি ঘটে! সব জায়গায় শুধু ঐ একই কথা, কখন কার ওপরে রাজার নজর পড়বে কে জানে! জনগণ সবাই নিজ নিজ কন্যা-স্ত্রী এবং পুত্রবধূদের বাড়ির ভেতরে আটক করে রাখে যেন রাজপরিষদের কেউ জানতে

না পারে তার বাড়িতে তরুণী কন্যা, পুত্রবধূ অথবা স্ত্রী আছে। কেউ ঘাটে পানি আনতে যায় না, কেউ কোনো কাজে বাইরে বের হবার সাহস পায় না। রাজ্যময় একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব ছড়িয়ে আছে।

রাজা মহাতাক শিবাজীর প্রতিদিন একটা সুন্দরী নারী চাই-ই চাই যদি পরিষদগণ খোঁজ না পায় তাহলে মহাতাক শিবাজী নিজে বেরিয়ে পড়ে এবং বিনা দ্বিধায় যে কোনো অন্দরমহল থেকে জোরপূর্বক নিয়ে আসে কোন এক তরুণীকে।

রাজা মহাতাকের এ আচরণে প্রজাগণ ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং প্রতিবাদ মুখর কিন্তু কেউ তার কাজে বাধা দিতে পারে না, কারণ তিনি রাজ্যের অধিপতি। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তারপর নিক্ষেপ করা হয় অন্ধকূপে। অন্যান্য দিনের মত আজ মহাতাক শিবাজী নিজে তার অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। জানতে তার রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি নাসির আলী সওদাগরের এক কন্যা আছে, নাম তার নাসিমা বানু। অপরূপ সুন্দরী আর গুণবতী। তেমনি ধর্মপরায়ণও।

অনেক দিন থেকে এই তরুণীর কাহিনী মহাতাক শিবাজী শুনে এসেছে। লোভাতুর শার্দুলের মত লালসায় ভরে উঠেছে তার মন কিন্তু কোনোক্রমে নাসিমা বানুকে করায়ত্ত করতে পারেনি। আজ রাজা মহাতাক কয়েকজন দুর্দান্ত অনুচরসহ নাসির আলী সওদাগরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

নাসির আলী সওদাগর সবেমাত্র নামাজ শেষ করে মোনাজাত করছিলো এমন সময় তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো রাজা মহাতাক শিবাজীর অনুচরগণ। তারা বন্দী করে ফেললো এই প্রবীণ মহৎ ব্যক্তিটিকে।

ততক্ষণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে আরও দুজন অনুচর।

বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর বলে উঠলেন—খবরদার, অন্তঃপুরে প্রবেশ করো না। তোমাদের ওপর আল্লাহতালার গজব নাজেল হবে।

বৃদ্ধের কথা তারা কানেই নিলো না।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাসিমাবানুকে ধরে ফেললো তারপর টেনেহিঁচড়ে বের করে আনলো বাইরে।

নাসিমাবানুর সমস্ত শরীরে চাদর আবৃত ছিলো, সে আরও জড়ো সড়ো হয়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো–আমাকে তোমরা স্পর্শ করো না। আমার পবিত্রতা তোমরা নষ্ট করো না। ছেড়ে দাও...... আমাকে ছেড়ে দাও......

কিন্তু রাজা শিবাজীর অনুচরগণ অট্টহাসি হেসে বললো—-মহারাজ শিবাজীর আদেশ পালন করতেই হবে। তোমার কোনো কথা আমরা শুনবো না।

ওদিকে নাসির আলী সওদাগর করুণভাবে শিবাজীর হাত মুঠায় চেপে ধরে বললো–আমাকে হত্যা করুন রাজা তবু আমার মেয়ের গায়ে হাত দেবেন না! আপনি আমাকে হত্যা। করুন,

রাজা মহাতাক শিবাজী বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগরের মুখে প্রচন্ড এক চড় দিয়ে বললোতোমাকে হত্যা করলেও তোমার মেয়ে রেহাই পাবে না। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি অনেক দিন হলো আমার মনে নাড়া দিয়েছে কিন্তু আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি তাই এতদিন তোমাকে রেহাই দিয়েছি..

শিবাজী, তোমার এই আচরণের জন্য তুমিও রেহাই পাবে না আল্লাহর দরবারে। তোমার শাস্তি তুমি পাবে......

এতবড় সাহস তোমার বৃদ্ধ, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

পারবে না।

তোমাকে হত্যা করে তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবো যেমন করে আর বহু মেয়েকে আমি নিয়ে গেছি। তোমার সাধ্য নেই আমার কাজে বাধা দেবার। অনুচরদের ইংগিত করলো রাজা শিবাজী।

রাজা শিবাজীর নির্দেশ পেয়ে তার অনুচরগণ নাসিমা বানুকে জোরপূর্বক ধরে ফেললো এবং তুলে নিলো কাঁধে। যেমনি দরজার দিকে অগ্রসর হবে ঠিক ঐ সময় একজন জমকালো মুর্তি ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর।

জমকালো মূর্তির দুহাতে দুটি রিভলভার।

পা দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলো জমকালো মূর্তি রাজা শিবাজীর অনুচরটির তলপেটে, যে ব্যক্তি নাসিমা বানুকে তুলে নিয়েছিলো কাঁধে।

জমকালো মূর্তির পদাঘাতে নাসিমানু সহ পড়ে গেলো লোকটা। নাসিমাবানু উঠে দাঁড়ালো।

জমকালো মূর্তি অপর জনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো, তারপর আর একজনকে।

রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লো দুজন রাজ-অনুচর।

তৃতীয় অনুচরটিকেও রেহাই দিলো না জমকালো মূর্তি।

রাজা শিবাজী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, প্রথমে কিছু অনুধাবন করতে না পারলেও পরমুহূর্তে সে বুঝতে পারলে তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সব ব্যর্থ হয়ে গেলো, এখন তাকে যমদূতের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। এতকাল ধরে সে নিজের রাজ্যে প্রজাদের ওপর যথেচ্ছাচার করে এসেছে। ইচ্ছামত বিচরণ করে ফিরেছে সে। মন যেখানে চায় সেখানে গেছে এবং যা খুশি করেছে। আজ হঠাৎ এমন বাধা আসবে ভাবতে পারেনি রাজা শিবাজী।

পরপর কয়েকজন অনুচর নিহত হওয়ায় রাজা শিবাজী স্থির থাকতে পারলো না, সেও আক্রমণ করলো জমকালো মূর্তিটিকে।

শুরু হলো তুমুল লড়াই।

রাজা শিবাজীর কয়েকজন অনুচর নিহত হলো আর কয়েকজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

শিবাজী ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত জমকালো মূর্তির সঙ্গে লড়াই করে চললো।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছেন নাসির আলী সওদাগর। তিনি চরম বিপদ মুহূর্তে এমন একজন সহায়ক পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, তিনি আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন কে এই জমকালো মূর্তি, যে এই বিপদ মুহূর্তে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে এসে হাজির হয়েছে! কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে, চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময়। কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন–মা, আল্লাহতায়ালার রহমত, তিনি তোক রক্ষা করার জন্য একে পাঠিয়েছেন।

নাসিমাবানুর চোখেমুখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছে, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তির দিকে। কে এই জমকালো মূর্তি যার সীমাহীন শক্তি নরপশু রাজা মহাতাক শিবাজীকে কাহিল করে ফেলেছে।

জমকালো মূর্তি তার হস্তস্থিত রিভলভার চেপে ধরলো রাজা মহাতাক শিবাজীর বুকে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আর নয় নরশয়তান, এবার তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবো। তোমার পাপের সমাপ্তি ঘটবে......জমকালো মূর্তির হাতের রিভলভার গর্জে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়লো এতদিনের নরপিশাচ রাজা মহাতাক শিবাজী।

বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর দুহাতে প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরলেন জমকালো মূর্তিকে। তিনি গদ গদ কণ্ঠে বললেন বাবা-কে তুমি এমন করে আমাদের ইজ্জত রক্ষা করলে?

জমকালো মূর্তি বললো–নাই বা জানলে বাবা আমার পরিচয়। আমি একজন মানুষ তোমাদের মঙ্গলকামী বন্ধু.......

জমকালো মূর্তির কথা শেষ হয় না, তার চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় বেশ কয়েকজন সৈনিক। তাদের সবার হাতে অস্ত্র।

বাধ্য হয়ে জমকালো মূর্তি হাত উঠালো।

কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর এবং নাসিমা বানুকে।

জমকালো মূর্তি হাত উপরে উঠালেও সে সজাগ রইলো। যেমনি ওরা তার হাতে হতাকড়া পরিয়ে দিতে গেলে অমনি জমকালো মূর্তি প্রচন্ড এক লাথি মেরে ফেলে দিলো

তারপর শুরু হলো আবার লড়াই।

জমকালো মূর্তি একা আর রাজা শিবাজীর অনুচরবর্গ দশ বারো জন হবে। তবুও ওরা পেরে উঠলো না, জমকালো মূর্তির সঙ্গে লড়াই করা ওদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো।

অল্প সময়ে ওদের কাবু করে অদৃশ্য হলো জমকালো মূর্তি।

এবার রাজা শিবাজীর লোজন বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর এবং তার কন্যা নাসিমা বানুকে বেঁধে নিয়ে চললো। রাজা শিবাজীর লাশ তুলে নিলো আর কয়েকজন সৈনিক।

রাজার এই মৃত্যু সংবাদ অল্পক্ষণে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত রাজ্যময়। ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হলো প্রজাদের মধ্যে। তাদের মধ্যে একটা খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে চললো তবে তারা প্রকাশ্য মনোভাব ব্যক্ত করতে পারলো না। আড়ালে চললো তাদের আলোচনা। এমন রাজার হাত থেকে তারা রক্ষা পেলো এ যেন তাদের পরম সৌভাগ্য। অনেক প্রজা গোপনে দুহাত তুলে দয়াময়ের কাছে শুকরিয়া করলো।

যখন রাজা শিবাজীর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন পথের দুধারে জনগণ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দেখছিলো। যে রাজার দাপটে অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তারা, তাদের পরিবার পরিজনদের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না, সেই অমানুষ রাজার অপমৃত্যু ঘটলো। এটা যেন তাদের মহাখুশীর ব্যাপার। কিন্তু নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য তারা সহ্য করতে পারছে না। তাদের দুঃখজনক অবস্থা দর্শন করে অনেকের চক্ষু অপূর্ণ হলো। তবে কারও সাহস হলো না কোনো কথা বলে এ ব্যাপারে।

সর্বাগ্রে চলেছে রাজা মহাতাক শিবাজীর কুচক্রী মন্ত্রী রঘুনাথ। তার চোখেমুখে হিংস্রপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। রাজা শিবাজীর মৃত্যুর জন্য তার তেমন কোনো অনুতাপ নেই, তার যত ক্ষোভ হলো নাসির আলী সওদাগরের ওপর। কে সে ব্যক্তি যে নাসির আলীর কন্যার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য হত্যা করলো রাজা মহাতাক শিবাজীকে। জমকালো মূর্তিটি কে এবং কোথা হতে তার আবির্ভাব ঘটেছিলো এ নিয়ে মন্ত্রী রঘুনাথের যত চিন্তা। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে তার মনে।

রাজ্যের জনগণ মনপ্রাণে খুশি হলেও তারা মনোভাব প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছিলো না। তারা শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নাসির আলী সওদাগরের জন্য ও তার কন্যা নাসিমাবানুর জন্য দুঃখ করছিলো, না জানি এই অসহায় বৃদ্ধের ও তার কন্যার ভাগ্যে কি আছে।

রাজা মহাতাক শিবাজীর নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে রাজ্যময় শোকসভা শুরু হলো সরকার পক্ষ থেকে। গদ গদ কণ্ঠে চললো তাকে নিয়ে আলোচনা।

কারাগারে বন্দী হলো বৃদ্ধ নাসির আলী ও তার কন্যা নাসিমা বানু। তাদের ওপর চললো নির্মম বেত্রাঘাত। বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সেই জমকালো মূর্তির পরিচয় না বললে তাদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

বেত্রাঘাত এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করা হলো বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে। তবু তারা সেই জমকালো মূর্তির পরিচয় বলতে সক্ষম হলো না, কারণ তারা জানে না কে সে ব্যক্তি।

*

কষাঘাতে জর্জরিত বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে রাজকারাগারে বন্দী করে রাখা হলো, তারপর একদিন পিতা ও কন্যাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। তাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড, সেই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট মন্ত্রী রঘুনাথ। তার চারপাশে অন্যান্য রাজকর্মচারী, যারা সব সময় রাজা মহাতাক শিবাজীকে ঘিরে থাকতো। সবার চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। তাদের মহান মহারাজকে হত্যা করেছে বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও নাসিমা বানু, তাই তাদেরকে প্রকাশ্য রাজপর্থে জনসমক্ষে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

একটি উঁচুস্থানে দুহাত দুপাশে টান করে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বৃদ্ধ ও তার কন্যাকে। অপর পাশে তীর-ধনু হাতে দন্ডায়মান দুজন রাজকর্মচারী জল্লাদ। তারা তীর-ধনু নিক্ষেপ করে হত্যা করবে বৃদ্ধ নাসির আলী ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে।

বৃদ্ধ নাসির আলী তাকালেন আকাশের দিকে। আপন মনেই তিনি বললেন, হে পাক পরওয়ার দেগার, তুমি মেহেরবান, তুমিই সব কিছুর মালিক, তুমিই সব কিছু জানো। এবার তাকালেন নিজ কন্যার মুখের দিকে। নাসিমা বানু অবিবাহিতা হলেও খুব পর্দা পুশিদা মেয়ে ছিলো সে। ওড়নার আঁচল দিয়ে মাথার চুলগুলো

জড়ানো এবং অর্ধেক আঁচল দিয়ে কণ্ঠদেশ ও বুক বেষ্টন করে আছে। নাসিমার গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

পিতা আর পুত্রী দৃষ্টি বিনিময় হলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে মন্ত্রী রঘুনাথ হাত উত্তোলন করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ধনুতে তীর সংযোজন করলো জল্লাদগণ কিন্তু ত পর তীর নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বেই তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো জল্লাদ দুজন।

সবাই বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো জমকালো মূর্তি অদুরে অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে, তার দুহাতে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র। শব্দবিহীন দুটি রিভলভার।

এবার বুঝতে কারও বাকি রইলো না। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সবাই, জমকালো মূর্তিই যে তাদের মহারাজকে হত্যা করেছে এটা সবাই জানতো।

কিছুক্ষণের জন্য সকলে স্তব্ধ হয়ে পড়লেও সজাগ হতে তাদের সময় লাগলো না। মন্ত্রীর নির্দেশে সৈন্যগণ ঘিরে ফেললো জমকালো মূর্তিকে।

কিন্তু তার পূর্বেই জমকালো মূর্তি বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে মুক্ত করে নিলো। জমকালো মূর্তির কোমরের বেল্টে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা ছিলো, ঐ ছোরা দিয়ে বৃদ্ধ ও তার কন্যার হাতের বাঁধন কেটে দ্রুত তুলে নিলো অশ্বপৃষ্ঠে।

চারদিক থেকে সৈন্যগণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলো, কিন্তু একটি অস্ত্রও তাদের দেহ স্পর্শ করতে সক্ষম হলো না।

জমকালো মূর্তি বৃদ্ধ ও তার কন্যাসহ বেরিয়ে গেলো উক্ত স্থান হতে। মন্ত্রী চিৎকার করে অনুচরদের নির্দেশ দিলো-যাও ঐ জমকালো মূর্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে এসো। যাও......

সবাই ছুটলো কিন্তু কেউ জমকালো মূর্তি বা তার সঙ্গীদ্বয়কে পাকড়াও করতে পারলো না। সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো অশ্ব সহ-জমকালো মূর্তি।

মন্ত্রী রঘুনাথের চোখে মুখে আগুন ঝরছে। তার হাতের অস্ত্র হাতেই রইলো, ব্যর্থ হলো তার সব প্রচেষ্টা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। রাগে-ক্ষোভে কালো হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল।

সমস্ত জনগণ অবাক হয়ে গেছে, তারা এই বধ্যভূমিতে এসেছিলো স্বচক্ষে হত্যাকাণ্ড দর্শন আশায়। এরা প্রায় সবাই রাজকর্মচারী এবং রাজপরিষদের লোক। মাঝে দুচার জন ছিলো যারা বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানুর করুণ অবস্থার জন্য দুঃখ অনুভব করে এসেছিলো। তারা খুশিতে উচ্ছল হলো, হাজার শুকরিয়া করলো তারা আল্লাহর দরবারে।

বহুদূরে এসে জমকালো মূর্তি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে পড়লো। নামিয়ে নিলো সে বৃদ্ধ নাসির আলী ও তার কন্যা নাসিমা বানুকে।

জায়গাটা জনহীন বনভূমি।

ঘন বন না হলেও বেশ বড় বড় পুরনো গাছ পালা আর উঁচু নীচু টিলায় ভর্তি। চারপাশে দেয়ালের মত-টিলাগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। একটি বৃহৎ আকার বৃক্ষতলে জমকালো মূর্তি ওদের নিয়ে দাঁড়ালো। নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে বললো তোমরা নিশ্চিন্ত। আর কোনো ভয় নেই।

বৃদ্ধ আর তরুণী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারা জানে না কে এই ব্যক্তি। কোথা হতে হলো তার আবির্ভাব। কেনই বা সে উদ্ধার করলো তাদের।

বৃদ্ধ আর তরুণীর চোখেমুখে বিস্ময় আর প্রশ্ন। বুঝতে পারে জমকালো মূর্তি। হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে বলে—জানি তোমরা অবাক হয়ে গেছে। কে আমি জানতে চাও।

হাঁ হাঁ বাবা, জানতে চাই কে তুমি? আর হঠাৎ কোথা হতে এসে আমাদের ইজ্জত রক্ষা করলে–শুধু-ইজ্জৎ নয় জীবন বাঁচালে?

হেসে বললো জমকালো মূর্তি–আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তোমাদের বন্ধু।

বৃদ্ধ অস্ফুট দীপ্ত কণ্ঠে বললো—হিতাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু...এই...এই কি তোমার পরিচয়? না, তুমি শুধু হিতাকাক্ষী আর বন্ধুই নও, তুমি আল্লাহর প্রেরিত ফেরেস্তা...হাঁ, আমি ভুল করিনি। অপূর্ব...অপূর্ব...তুমি অপূর্ব...বলো কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

তরুণী বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তি মুখমন্ডলের দিকে। নাসিমাবানুর দিকে তাকায় জমকালো মূর্তি, ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। বুঝতে পারে জমকালো মূর্তি তার পিতার মতই তরুণীর মনেও তার পরিচয় জানার বাসনা রয়েছে। বলে সে—আমি দস্যু বনহুর।

তুমি! তুমি সেই দস্যু বনহুর!

হা।

আমি তাই ধারণা করেছিলাম। লোকমুখে শুনেছি তোমার নাম। শুনেছি তোমার ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী। দস্যু বনহুর ....তুমি...তুমি দস্যু বনহুর। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো বস। তোমার নাম, কাহিনী আমাকে অভিভূত করেছিলো। ভাবতাম এই দুনিয়ায় এখনও এই জমানায় এমন ব্যক্তিও আছে-যার কোনো তুলনা হয় না।

তুমি বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছে বাবা। তোমাদের দোয়া আমার কাম্য। আল্লাহর রহমত ছাড়া আমি তোমাদের বিপদমুক্ত করতে সক্ষম হতাম না। তিনিই সব প্রশংসার মালিক।

তরুণী বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, ভাবছে এই সেই পুরুষ যার কাহিনী সমস্ত পৃথিবীময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সত্যি অপূর্ব এক মানুষ!

বনহুর বললো–তোমরা এখানে থাকো, আমি মন্ত্রীবর রঘুনাথকে সায়েস্তা করে ফিরে আসবো। যেদিন তোমাদের বাসভূমি তোমাদের জন্য নিরাপদ স্থান হবে সেদিন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

যাও বৎস, যাও। তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। বৃদ্ধ কথাগুলো বললেন।

বনহুর বললোতোমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে তারপর আমি যাবো।

এই বনে কোথায় খাবার পাবে বাবা তুমি?

চারদিকে তাকিয়ে বললো বনহুর–নিশ্চয়ই ফলমূলের সন্ধান পাবো কারণ নানা জাতীয় বৃক্ষলতাগুল্মের সমাবেশ দেখতে পাচ্ছি।

বনহুর তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো।

তাজ প্রস্তুত ছিলো, প্রভুকে পেয়ে মাথা দুলিয়ে একটু শব্দ করলো মাত্র।

বনহুর চলে গেলো।

অশ্বখুরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো ঘন বনের অন্তরালে।

বৃদ্ধ কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন–দেখলি মা, আল্লাহতায়ালা কি ভাবে মান-ইজ্জত এবং জীবন রক্ষা করেন। হাজার হাজার শুকরিয়া তার দরবারে।

নাসিমা বানুর কণ্ঠ যেন রোধ হয়ে গেছে। ভাব ভাষা সব যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। নাসিমা বানু ভাবতে পারেনি কেউ তাদের এভাবে রক্ষা করবে। তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোঁটা অশ্রু। পিতা-পুত্রী মিলে শুকরিয়া নামাজ আদায় করলেন।

এক সময় ফিরে আসে বনহুর।

তার পাগড়ির আচলে একগাদা সুপক্ক ফল।

বনহুর ফলগুলো বৃদ্ধ ও তাঁর কন্যার সম্মুখে রেখে বললোতোমরা এই ফল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করো। আমি আবার ফিরে আসবো।

নাসিমা বানু বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—আপনি বড় ক্লান্ত। কিছু ফল আপনিও গ্রহণ করুন। না হলে আমরা ফল খেয়ে তৃপ্তি পাবো না।

এই প্রথম তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনলে বনহুর। পবিত্র নিষ্পাপ সে কণ্ঠ। বনহুর তাকালো তার চেহারার দিকে। এমন ফুলের মত নির্মম একটি জীবন রক্ষা করতে

বনহুর সক্ষম হয়েছে, সত্যি-এ জন্য তার মন তৃপ্ত হয়ে উঠলো। বললো—বেশ, আমিও খাচ্ছি, তোমরা খাও।

বনহুর গাছের একটি মোটা শিকড়ের ওপর বসে পড়ে তুলে নিলো একটা ফল। তারপর সে খেতে শুরু করলো।

বৃদ্ধ নিজেও খেতে লাগলেন এবং কন্যার হাতে তুলে দিলেন একটা ফল।

ফলগুলো মিষ্ট ছিলো।

এমন ফল বনহুর আরও পূর্বে খেয়েছে। কতকটা নাশপাতি ফলের মত।

ক্ষুধা নিবারণে নির্ভরযোগ্য ফল।

বনহুর বিদায় চাইলো।

পিতাপুত্রী পরম আনন্দ সহকারে ফল খেতে লাগলো।

বৃদ্ধ বললো–বাবা, তুমি মহৎ জানতাম কিন্তু তোমার হৃদয় এত সুন্দর, এত উদার তা জানতাম না। আমি আশীর্বাদ করি তোমার নাম চিরস্মরণীয় হবে।

বনহুর একটু হাসলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আবার দেখা হবে, চলি।

বৃদ্ধ হাত তুলে বললো——যাও বৎস যাও। খোদা তোমার সহায়।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসলো।

বৃদ্ধ নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যা নাসিমা বানু অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

*

মন্ত্রী রঘুনাথ তার দুর্দান্ত অনুচরদের সামনে দন্ডায়মান। তার চক্ষুদ্বয় হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। কুদ্ধকণ্ঠে বললো মন্ত্রী রঘুনাথ-তোমরা কেউ তাদের সন্ধান পেলে না?

একজন উত্তর দিলো–না, আমরা সমস্ত শহরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও সেই জমকালো পোশাক পরিহিত অশ্বারোহী অথবা নাসির আলী সওদাগর ও তার কন্যার খোঁজ পেলাম না।

কথা শেষ করতে না করতে মন্ত্রী রঘুনাথ তার পাশে দন্ডায়মান রাজ-কর্মচারীর কোমরবন্ধ হতে সূতীক্ষ্ণধার তরবারি খুলে নিয়ে বসিয়ে ছিলো অনুচরটার তলপেটে।

তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো লোকটা।

অপর এক ব্যক্তির দিকে তাকালে মন্ত্রী।

সঙ্গীর নির্মম অবস্থা দর্শন করে সব রাজকর্মচারী স্থবিরের মত হতবাক হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় লোকটা তখনও ছটফট করছে। উপস্থিত সবাই একবার মন্ত্রীবর এবং পরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়া লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

এমন অবস্থার জন্য কোনো রাজকর্মচারী প্রস্তুত ছিলো না। ভেতর ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। ঠিক ঐ সময় সেখানে উপস্থিত হলো জমকালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বয়ং দস্যু বনহুর। তার দু হাতে দুটি রিভলভার।

মন্ত্রীবর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলোনরপশু, তুমি আবার এসেছো?

নরপশু আমি না তুমি! বললো বনহুর।

মন্ত্রী রঘুনাথ ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত ফোঁস করে আক্রমণ করলো।

মন্ত্রীবর তার অনুচরদের ইংগিত করলো তার সঙ্গে তারাও যেন আক্রমণ করে কিন্তু তারা। নিশ্চুপ রইলো, কেউ এগুলো না মন্ত্রীবরের নির্দেশ পালনে।

বনহুর পদাঘাতে ধরাশায়ী করলো মন্ত্রী রঘুনাথকে।

তার হাতের তরবারি ছিটকে পড়লো দূরে।

বনহুর দক্ষিণ পা তুলে দিলো রঘুনাথের বুকের ওপর।

রাজপারিষদবর্গ সবাই নিশ্চুপ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো, তারা সবাই হতবাক হলেও মনে মনে খুশি হলো। মন্ত্রী রঘুনাথের জন্যই আজ দেশময় অশান্তি বিরাজ করছে। রাজা মহাতাক শিবাজীকে অসৎ পথে উৎসাহ যুগিয়েছে এই নরাধম। কত মানুষ আজ নিঃস্ব রিক্ত অসহায় অবস্থায় কাল কাটাচ্ছে। কত অসহায় নারী সতীত্ব হারিয়ে আত্নহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কত বৃদ্ধ আজ সর্বহারা পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

রাজ্যের অবস্থা যখন চরমে তখন জমকালো মূর্তির আবির্ভাব যেন নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো। রাজকর্মচারিগণ বাধ্য ছিলো রাজা ও তার মন্ত্রীর নির্দেশ পালনে। তাই তারা নীরবে আদেশ পালন করে যেতে আজ এ মুহূর্তে কারও মনে সহানুভূতি এলো না। সবাই যেন এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করছিলো।

মন্ত্রীবরের কোনো নির্দেশ মানলো না তার পারিষদবর্গ সবাই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের মনেও কিছুটা ভীতিভাব জেগে উঠলো।

ততক্ষণে বনহুরের রিভলভার গর্জে উঠেছে।

তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো মন্ত্রিবর। তারপর নীরব হয়ে গেলো তার দেহটা।

বনহুর আর একবার তাকালো কিছুক্ষণ পূর্বে মন্ত্রীবরের হাতে নিহত রাজকর্মচারীর মৃতদেহটার দিকে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

কেউ তাকে বাধা দিলো না বা দেবার সাহস করলো না সকলের চোখেমুখে বিস্ময়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় সবাই। বাইরে শোনা গেলো অশ্বপদশব্দ।

কেউ কেউ ছুটে এলো বাইরে, তারা দেখলো জমকালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি অশ্বপৃষ্ঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো দৃষ্টির আড়ালে।

ফিরে এলো বনহুর সেই স্থানে যেখানে বৃদ্ধ নাসির আলী ও তার কন্যা অপেক্ষা করছিলো।

অশ্বখুরের শব্দ কানে আসতেই আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উ কন্যা নাসিমাবানুর মুখমন্ডল।

বৃদ্ধ আর তার কন্যা উঠে দাঁড়ালো, তাদের দুচোখে খুশির উচ্ছ্বাস।

বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে।

অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামতেই আনন্দে গদ গদ কণ্ঠে বললো–বৎস, তুমি সুস্থ দেহে ফিরে এসেছে, এটা যে আমাদের কত আনন্দের কথা তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

বনহুর একটু হেসে বললো—আমার জন্য তোমাদের ভাবনার অন্ত নেই দেখছি! কিন্তু কি করে ভাবলে আমি কোনো বিপদে পড়েছি বা পড়বো?

বললো বৃদ্ধ—-আমার আশংকা হচ্ছিলো।

দোয়া করো বাবা, যেন খোদা আমার সহায় হন। বললো বনহুর।

বৃদ্ধের দুচোখ ভরে পানি এলো, বললেন তিনি-উদ্দেশ্য যার মহৎ খোদা তার সহায়। বাবা, দোয়া করি তুমি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ পৃথিবীর বুকে এবং পরকালেও তুমি তোমার কর্মফলের পাওনা পাবে। তুমি কোনো দিকে ঠকবে না……

সত্যি! সত্যি বলছো বাবা?

হাঁ।

আমি যে বড় পাপী! বনহুর কথাটা বলে উদাস নয়নে তাকালো দুরে নীল আকাশটা যেখানে ঢলে পড়েছে পাহাড়ের কোলে সেইদিকে। কত কথা মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে বনহুরের। জীবনের প্রতিটি ঘটনা ভেসে উঠতে লাগলো তার মানস পটে।

বৃদ্ধ বললো কি ভাবছো বস?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে তাকালো বনহুর।

দু'চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ বনহুরের পৌরুষদৃপ্ত বলিষ্ঠ মুখমন্ডলের দিকে। বললো বৃদ্ধ—তুমি কি ভাবছো বলবে আমাকে?

বলবো। বাবা আমি একজন দস্যু-ডাকু।

এ কথা আমি জানি বস আর জানি বলেই তোমাকে দেখবার এত সাধ ছিলো আমার। একটু থেমে বললো বৃদ্ধসে সাধ আমার এমনভাবে পূর্ণ হবে এটা জানতাম না। দস্যু-ডাকু তুমি হতে পারে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য মহৎ আর সেই কারণেই তুমি মহান…

বাবা!

হাঁ বৎস!

বাবা, তুমি জানো না আমার এই হাত দিয়ে আমি কত হত্যা করেছি…এই আজ, আজও আমি হত্যা করেছি একজনকে।

তুমি যাকে হত্যা করেছে সে মানুষ নয় অমানুষ। আর তাকে হত্যা করে তুমি দেশের মঙ্গল করেছো। আল্লাহ-তালা বলেছেন যে বা যারা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের প্রতি অন্যায় করে তাদের তুমি আঘাত করো। বনহুর, তোমাকে না দেখলে কেউ বুঝবে না তুমি কত বড় সত্য আর ন্যায়পরায়ণ।

এটা তোমার কথা বাবা। তোমরা যতই বলো আমি নিজেকে কিছুতেই নির্দোষ বলে মনে করতে পারি না। কারণ আমি জানি…

না না, এমন কথা মুখে এনো না। কে বলে তুমি দোষী? বনহুর আমার সঙ্গে তোমার এই প্রথম পরিচয় কিন্তু আমি তোমার সব কিছু জানি। বৎস, তুমি নরশয়তান রাজাকে নিহত করে দেশবাসীর যে মঙ্গলসাধন করেছে তা কোনো তুলনা হয় না। বৎসর শুধু রাজা মহাতাক শিবাজীকেই তুমি নিমূর্ল করোনি তার সাহায্যকারী মন্ত্রিবরকেও তুমি হত্যা করেছে……

এ কথা তোমার সত্য বাবা। আমি শুধু রাজাকে নিহত করি নাই তার সহায় মন্ত্রিবরকেও যমালয়ে পাঠিয়েছি। নির্মূল করেছি এই কুৎসিত কর্মকর্তাদের। তোমরা এখন মুক্ত……

হাঁ, আমি সব জানতে পেরেছি আর জানতে পেরেছি বলেই তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি বস তুমি চিরঅক্ষয় হবে।

চলো বাবা তোমাদের বাসস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসি। এসো নাসিমা, আর কোনো ভয় নেই তোমাদের বোন।

নাসিমা বানুর দুচোখে অশ্রু ঝরে পড়ে।

বনহুর তাদের তুলে নেয় অশ্বপৃষ্ঠে।

*

বনহুর আস্তানায় ফিরে আসার পর শুরু হলো আনন্দ উৎসব। তার অনুচরদের মনে খুশির উৎস, সর্দার রাজা মহাতাক শিবাজী এবং তার মন্ত্রীবর রাঘুনাথকে সমুলে বিনাশ করেছে। সেই রাজ্যে প্রজাদের মুখে হাসি ফুটেছে, আর তারা রাজার ভয়ে আতকে ওঠে না। আর তারা নিজেদের সুন্দরী স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত নয়। মহাকাল চক্র থেকে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে।

বনহুর তার দরবারকক্ষে বসে ছিলো।

নূরী আর রহমান তার পাশে।

অনুচরগণ হাসিমুখে দন্ডায়মান।

দেয়ালে মশাল জ্বলছে।

মশালের আলোতে বনহুরের জমকালো পোশাক চক চক করছে। অনুচরদের হাতের বর্শাফলকগুলো ও স্পষ্ট নজরে পড়ছে। তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সর্দারের নির্দেশের প্রতীক্ষায়।

বনহুর বললো–তোমাদের আনন্দ আমার মনকে উদ্ভাসীত করেছে। আজ আমি তোমাদের খুশিতে অংশীদার হয়ে বলছি–তোমরা কি চাও? আজ তোমরা যা চাহিবে আমি তাই দেবো।

অনুচরদের চোখেমুখে একটা দীপ্তভাব ফুটে উঠেছে।

কে কি চাইবে এই চিন্তা তাদের মনে।

এমন সময় ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে বৃদ্ধা দাইমা লাঠিতে করে। বয়স তার প্রায় এক শর কাছাকাছি। চোখে ভাল দেখে না তবুও বসে থাকে না বৃদ্ধা। সব সময় আস্তানার সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাশোনা করে। বনহুরকে দাইমা নিজের সন্তানের চেয়ে কম মনে করে না। কালু খর কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন নিঃসন্তান

দাইমা আনন্দে গ্রহণ করেছিলো, তারপর হতে তাকে মানুষ করেছে আদর যত্ন আর প্রাণঢালা স্নেহ দিয়ে। যেমন ভালবাসতো কালু খ তেমনি স্নেহ-আদরযত্ন করতো দাইমা বনহুরকে।

বনহুরও দাইমাকে মায়ের মত ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। যখন সে সময় পেতে দাইমার পাশে এসে বসতো। অনেক কথা, অনেক কাহিনী বনহুর শুনেছে দাইমার মুখে। কোনোদিন বনহুর দাইমাকে অবহেলা করেনি আজ সেই দাইমাকে দরবারগুহায় গমন করতে দেখে বনহুর অবাক হলেও হাত বাড়িয়ে দিলো এবং এগিয়ে নিলো সে নিজের পাশে।

দাইমা তার ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের দিকে।

কি বলতে চায় দাইমা। তবে কি কিছু সে চাইবে তার কাছে শুধু বনহুর অবাক হয়নি, অবাক হয়েছে সবাই। অনুচরগণ সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

নূরী তাকালো রহমানের দিকে।

বৃদ্ধা দাইমার আবার কি চাইবার আছে। সে তো এখন পরপারের যাত্রী। বসে বসে শুন গুন করে গান গায় আর গল্প করে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কি ভাবে সেই জানে। কেউ কিছু বললে ফোকলা মুখে একটু হেসে বলে, আমি কি ভাবি তা তোদের স্তনে কোনো লাভ হবে না। যা তোরা নিজের কাজ করগে।

কোনোদিন মনের গোপন কথা বলেনি দাইমা কারও কাছে।

আজ দাইমার চোখেমুখে একটা দীপ্ত ভাব, কি বলতে চায় সে।

বনহুর বললো—দাইমা কিছু বলবে?

হাঁ বলবো বলেই তো-এলাম। শুনলাম সর্দার আজ যে যা চাইবে তাই তাকে দেবে—

বলো কি চাও তুমি? বললো বনহুর।

বৃদ্ধা দাইমা বললো–আমি যা চাইবো তাই দিবে তো আমাকে?

হাঁ দেবো! বলো।

সত্যি দেবে?

হ।

আমি কোনো জিনিস চাই না, শুধু কথা দেবে।

কথা?

হাঁ, যা বলবো তা পালন করতে হবে।

সকলের চোখেমুখে বিস্ময়, সবাই উনখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছে কি কথা বলতে চায় দাইমা!

নূরী আর রহমান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি এমন কথা যা দাইমা বলবে আজ সর্দারকে।

বনহুরের চোখমুখ হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তময়।

দাইমা বললো—আমি চাই তুমি আবার ফিরে যাও তোমার মা, তোমার জননীর কাছে। একদিন যার বুক খালি করে তুমি চলে এসেছিলে আবার পূর্ণ করো বনহুর!

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বললো—দাইমা।

উপস্থিত সবার চোখে মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো। দাইমা একি কথা বলছে। যদিও কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তা কি সম্ভব?

দাইমা বলে চলেছে। একদিন কালু খাঁ তোমাকে কুড়িয়ে এনে দিয়েছিলো আমার হাতে। সেদিন আমি তোমাকে নিয়ে অনেক ভেবেছিলাম, না জানি কার সন্তান, কে তোমার জননী। সন্তানহারা মায়ের ব্যথা কত যে জ্বালাময় আমি তা জানি। সেদিন আমি কাল খাকে বলেছিলাম, সর্দার, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়। মায়ের কোলে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়। কিন্তু কালু খাঁ সেদিন লোভ লালসা আর

মোগ্রস্ত ছিলো তাই নিঃসন্তান কালু খাঁ আমার কথায় কান দেয়নি। একটু চুপ থেকে বৃদ্ধ দাইমা পুনরায় বললো—সব সময় আমার চোখে একটা অসহায় মায়ের করুন মুখ দেখতে পেয়েছি। দুটি চোখ হাহাকার করে খুঁজে ফিরছে তার আদরের দুলালকে। বনহুর, আমি আর কিছুই চাই না, চাই তুই ফিরে যাবি তোর মায়ের কোলে।

[পরবর্তী বই ষড়যন্ত্রের ধারে দস্যু বনহুর]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০১ অন্ধকারের আতঙ্ক

পরবর্তী:

৮.০৩ ষড়যন্ত্রের খপ্পরে দস্যু বনহুর »